মাসুদ রানা

পালাও, রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

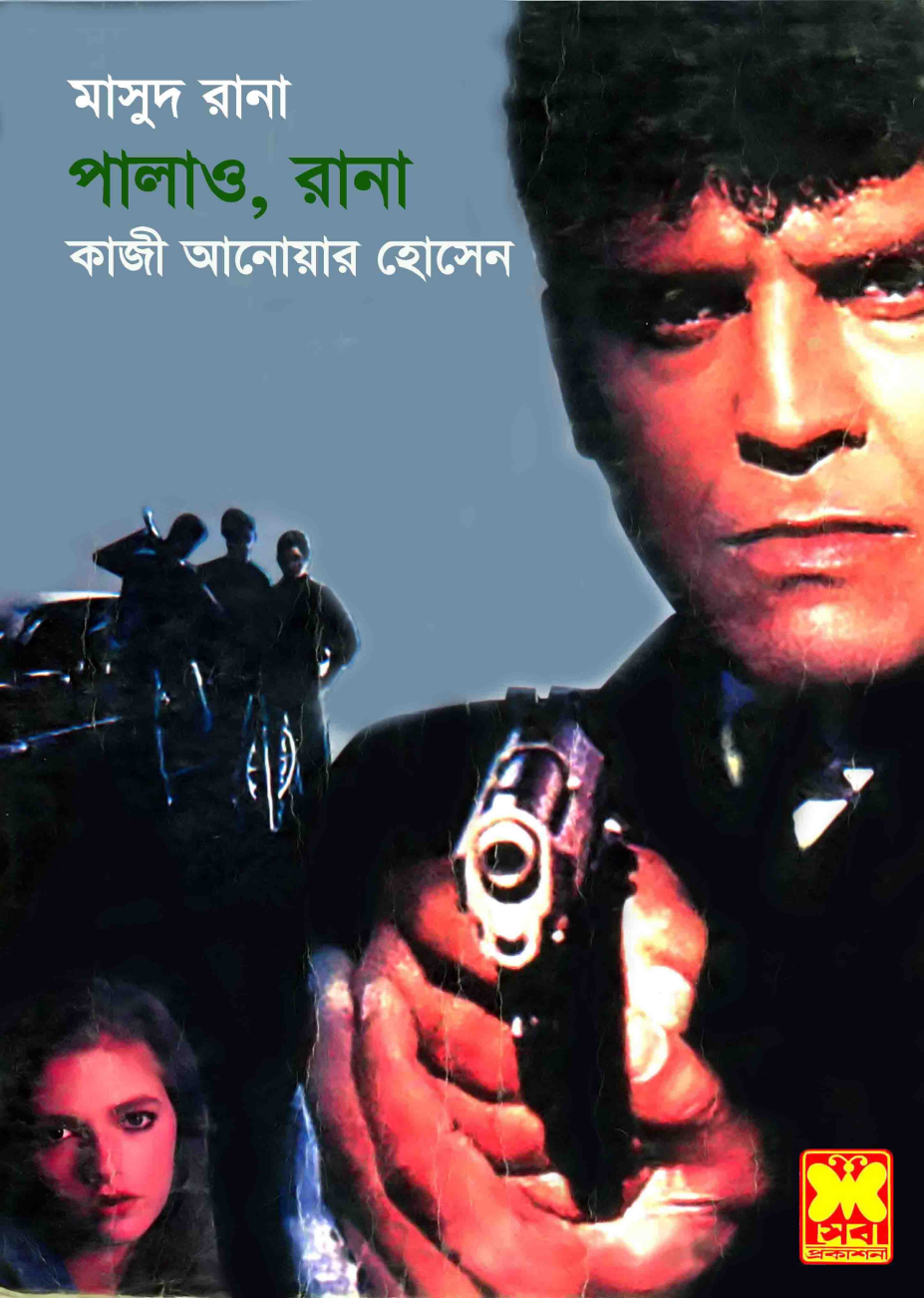

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

পালাও, রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

স্পিটসবার্জেন-আর্কটিক সার্কেলের বরফমোড়া এক ল্যান্ডস্কেপ। জায়গাটা নরওয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল রাশিয়া, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় থমকে গেল বিশ্ব। জানা গেল, বাংলাদেশেরই এক কীর্তিমান সন্তান জায়গাটাকে পেটে সাজিয়ে মস্কোর হাতে দিয়েছে। একদল কমান্ডো নিয়ে ছুটে গেল মাসুদ রানা ও সোহানা। প্লাটা বেরগেটে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর ট্রেনিং পাওয়া, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল এবং নির্দয় স্পেৎসনাজ বাহিনীর সামনে পড়ে গেল রানা বাহিনী।

পালাবে? পথ নেই। সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকারভ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

পালাও, রানা

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে চলেছে। নভেম্বরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত টানা চার মাস সূর্যের মুখ দেখেনি আর্কটিক ল্যান্ডস্কেপ। এ আঁধারের যেন কোন অন্ত নেই। অবশ্য মেঘমুক্ত আকাশে দিনের বেলা বরফের প্রতিফলন অদ্ভুত এক আলো সৃষ্টি করে, অনেকটা জোছনার মত। দেখতে কোন সমস্যা হয় না।

প্রথমদিকে ব্যাপারটা ভাল লাগত না পলকভনিক (কর্নেল) ম্যাকারভের। দিনকে মনে হত মরা মরা, নির্জীব। গত দু'মাসে তা সয়ে গেছে, এখন সে সব ভুলে গেছে সে। মনে মনে হাসল লোকটা, একদিন হয়তো এই পরিবেশই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তার কাছে। হয়তো মস্কোর প্রতিদিনের সূর্যকেই তখন আর ভাল লাগবে না।

মস্কোর কথা মনে হতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরলো। দু'মাসের কিছু বেশিই হবে আর্কটিক অঞ্চলের স্পিটসবার্গেন নামের বাজপড়া এই জায়গায় এসেছে সে, এরমধ্যে স্ত্রী আর একমাত্র ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হয়নি। আরও কতদিন হবে না, সেটা অনিশ্চিত। দু'মাস, চার মাস? নাকি ছয় মাস? কানের লতি চুলকে সামনে তাকাল সে। যত মাসই লাগুক, কিছু করার নেই তার। ভাবচক্কর দেখে মনে হচ্ছে, শুধু তার কেন মস্কোরও কিছু করার নেই।

সে ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তো প্রফেসর ত্রিপাঠীর আছে।

এখন সে-ই স্পিটসবার্গেনের মা-বাপ। লোকটা যা বলে, এক কথায় তাই মেনে নেয় মস্কো। কোন প্রশ্ন তোলে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, পলিট ব্যুরোর বেশিরভাগ সদস্যের সাথে কড়া দহরম-মহরম রয়েছে মানুষটার। রীতিমত শ্রদ্ধা করে তারা সবাই প্রফেসরকে। ম্যাকারভ জানে, এই লোকটির প্রস্তাব পেয়েই স্পিটসবার্গেনকে হজম করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এ-ও আরেক অদ্ভুত কাণ্ড। কোন বিদেশীর কথামত তার দেশ কখনও এমন কাজ করেছে বলে নজির নেই। সত্যিই বড় অদ্ভুত।

কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালা দিয়ে বাইরের এয়ারফিল্ডের দিকে তাকাল কর্নেল ম্যাকারভ, তারপর পুবদিকে। প্রথমেই চোখে পড়ল বিশাল কোল-লোডিং জেটি। ওটার কাছেই প্রফেসরের মাইনিং অফিস। বড়, দোতলা বিল্ডিং। ওটার দু'পাশে আরও কয়েকটা বিল্ডিং আছে, ওগুলো অন্য মাইনারদের। মাথায় বরফের পুরু স্তর। জুন মাস পর্যন্ত থাকবে ওরকমই। তারপর, সূর্য উঠলে একটু একটু করে গলতে শুরু করবে।

পশ্চিমের প্রশস্ত ফিওর্ডের দিকে তাকাল কর্নেল। স্রেফ বরফের মাঠে পরিণত হয়ে গেছে ওটা। সামনে লংইয়ারবিয়েন এয়ারফিল্ডের রানওয়ে। বড় এক পাহাড় আছে ওটার শেষ মাথায়। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই পাহাড় এই হতচ্ছাড়া

জায়গায়। তবে রানওয়ের শেষ মাথার পাহাড়টা অন্যগুলোর মত এবড়োখেবড়ো বা চোখা চুড়োর নয়, ওটার চূড়া প্রায় সমতল।

দূর থেকে ভৌতিক কাঠামোর মত লাগে দেখতে। তার ওপরে টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে কিছু তারা। মাথা প্রায় সমতল বলে স্থানীয়রা পাহাড়টার নাম রেখেছে প্লাটা বেরগেট। গরমকালে চেহারা বদলে যায় ওটার, এখানকার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কাছে শুনেছে সে, জুলাইয়ে বরফ পুরোপুরি গলে যায়, তখন জ্যান্ত হয়ে ওঠে পাহাড়ের ওপাশের এক ছোট্ট উপত্যকা। লাল ও হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুলে ভরে ওঠে জায়গাটা। বুনো রেইনডিয়ার তার নিচের ঢালে চরে বেড়ায়। কখনও কখনও পোলার বেয়ারও দেখা যায় একটা-দুটো।

কিন্তু বছরের এই সময়ে প্লাটা বেরগেট জমে থাকে, মুখ ভার করে থাকে। চেহারা দেখলে ভয় লাগে।

'ফ্লাইট ঠিক সময় ল্যান্ড করছে তো, পলকভনিক?' পিছন থেকে ভরাট গলার প্রশ্নটা শুনে সচকিত হলো কর্নেল।

'ইয়েস, স্যার,' প্রায় অ্যাটেনশন হয়ে গেল লোকটাকে দেখে।

প্রফেসর ত্রিপাঠী। দৈর্ঘ্যে প্রায় তার সমানই হবে মানুষটা, কিন্তু চওড়ায় বেশি। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া, কাঁচাপাকা চুল। এলোমেলো। জুলফির কাছে বেশিরভাগ পাকা। ওগুলো তার চেহারায় চমৎকার একটা আভিজাত্যের ছাপ এনে দিয়েছে। বয়স পঞ্চাশের মত।

ওভারকোট খুলে দরজার হুকে ঝুলিয়ে রাখল সে, এক পা টেনে টেনে ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল তার পাশে। এক পায়ে সমস্যা আছে ভদ্রলোকের। চেহারা বেশ প্রসন্ন। অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করে বলে হোক, অথবা ভয় করে বলেই হোক, একটু সরে দাঁড়াল কর্নেল ম্যাকারভ। কেন যেন এই লোকের বেশি কাছে যেতে সাহস হয় না তার। নিজের চারদিকে ব্যক্তিত্ব আর কর্তৃত্বের এমনই এক দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে রেখেছে লোকটা, যার থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ বলে মনে হয়।

প্ল্যান-প্রোগ্রাম পাকা হওয়ার পর মস্কোয় প্রফেসরকে প্রথমবার দেখেই টের পেয়েছিল সে, এ লোক হুকুম তামিল করতে জন্মায়নি। জন্মেছে হুকুম দিতে।

'ফর্টিন অ্যান্ড জিরো ফাইভ আওয়ারে, রাইট?' এবারের প্রশ্নটা নির্ভুল রুশ উচ্চারণে করল লোকটা। তাকে এশিয়ান মনে হয় ম্যাকারভের, খুব সম্ভব ভারতীয়। অনেকগুলো ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে।

'রাইট, স্যার,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। ভেতরে ভেতরে বিস্মিত, একদম সঠিক সময় লোকটা কি করে জানল ভেবে। কর্নেল নিজেই জেনেছে পাঁচ মিনিট আগে। মারমানস্ক থেকে আকাশে ওড়ার পর এখানকার টাওয়ারকে জানিয়েছে সেটার পাইলট। ম্যাকারভ জানালে তবেই ত্রিপাঠীর জানার কথা, অথচ সে জানায়নি। তার কোন ধারণাই নেই যে এখানকার প্রতিটা টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করে রেখেছে ত্রিপাঠী। এমনকি তারটাতেও। অ্যারোফ্লোটের ম্যানেজার হয়ে যেদিন সে এসেছে, তার কদিন আগে থেকে।

তার চিন্তা পড়ে ফেলল প্রফেসর। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস ফুটি ফুটি করেও ফুটল না। মিলিয়ে গেল। ঘড়িতে নজর বুলিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে

তাকাল। তারপর যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'সময় বেশি নেই। বাকি প্রস্তুতি সেরে ফেলা ভাল।'

'স্যার!' ব্যস্ত হয়ে উঠল কর্নেল। রুমের আরেক মাথায় বসা নরওয়েজিয়ান ট্রাফিক অফিসার লোকটার দিকে তাকাল। ফলভিক নাম তার। ছোটখাট, পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মত বয়স। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। 'মিস্টার ফলভিক, নতুন কোন ইনফর্মেশন?'

কাজ থেকে মুখ তুলল না সে। মাথা নাড়ল, 'না।'

জানা কথা, জবাবটা "না"-ই হবে। কেন না, খবর কিছু এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকেই জানাবে ফলভিক। তবু ত্রিপাঠীকে তৎপরতা দেখানোর জন্যে প্রশ্নটা করেছে সে। 'আমি কি ফিল্ডে যাব, স্যার?'

'এখনই কেন?' বলল প্রফেসর। 'সময় আছে এখনও। শুধু শুধু ঠাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কি দরকার?'

সামনে তাকাল। মুহূর্তে ভুলে গেছে কর্নেলের কথা। অন্য কথা ভাবছে। স্পিট্‌সবার্গেনের বড় এক কয়লা খনির মালিক সে। স্পিটসবার্গেনকে ২০ বিলিয়ন ডলারে মস্কোর কাছে 'বিক্রি করে দিয়েছে' সুযোগ বুঝে।

ওটা আসলে কথার কথা। সোয়ালবার আর্কিপেলাগোর এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা গ্রাস করতে পারলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কি লাভ, সেই আইডিয়াই কেবল বিক্রি করেছে সে মস্কোর কাছে। প্রথমে দর হেঁকেছিল ৪০ বিলিয়ন, কিন্তু ওরা এমন অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল, শেষ পর্যন্ত অর্ধেকেই রাজি হতে হলো। না হয়ে উপায় ছিল না। ওদেশের পলিট ব্যুরোর কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাদের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্টের কানে প্রস্তাবটা পৌঁছে দিয়েছিল সে। পরে যখন তারাই ধরাধরি শুরু করে দিল, তখন রাজি না হয়ে উপায় কি?

অর্ধেক টাকা চুক্তি অনুযায়ী আগেই পেয়ে গেছে সে, এখন ভালয় ভালয় অবশিষ্ট কাজ মিটে গেলে বাকি টাকা নিয়ে কেটে পড়বে। পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মস্কোর কুত্তা-কামড়াকামড়ির মধ্যে থাকার কোন ইচ্ছে তার নেই।

বুক ভরে আর্কটিকের ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিল সে। সামনের উন্মুক্ত এয়ারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে মনে মনে জন মানরো লংইয়ারের উদ্দেশে বলল, চির স্বর্গবাসী হও, ভায়া। সুখে থাকো। পরক্ষণে আনমনা হয়ে গেল।

বরফ যুগে এই এলাকা ছিল নো-ম্যানস-ল্যান্ড, ভাবছে প্রফেসর ত্রিপাঠী। কেউ আসত না। অনেক-অনেক পরে, ১৯০৫ সালে এক আমেরিকান, জন মানরো লংইয়ার ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয় এখানে। কোল মাইনিং শুরু করে। তার দেখাদেখি আরও অনেকেই আসে। প্রচুর কয়লা এখানে, কাজেই মাইনিং ব্যবসা দিনে দিনে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

একেবারে গায়ের ওপরে বলে কয়েক বছর পর জায়গাটা দখল করে নেয় নরওয়ে। প্রথমে এ নিয়ে হম্বিতম্বি করেছিল মস্কো, কিন্তু সে সময় জারশাসিত রাশিয়া দুর্বল ছিল বলে বিশেষ কাজ হয়নি তাতে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা নরওয়ের দখল মেনে নেয়। মাইনিং ব্যবসা আরও বাড়াবার ব্যাপারে অসলোর সাথে

আলাপ-আলোচনা শুরু করে। প্রথমবার তাতে ছেদ পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে। যুদ্ধ শেষে কয়লা উত্তোলন শুরু করে তারা। কয়েক বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়।

নাজি বাহিনী দখল করে নেয় গোটা সোয়ালবার আর্কিপেলাগো। যুদ্ধের শেষ দিকে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সম্মিলিত অভিযান চালিয়ে মুক্ত করে অঞ্চলটা। সে কথা মনে রেখে যুদ্ধের পর নরওয়ে নতুন আইন করে স্পিটসবার্গেনের ক্ষেত্রে। তা হলো: যে কোন দেশ বা ব্যক্তি নির্দিষ্ট অঙ্কের কর দিয়ে কয়লা তুলতে পারবে সেখান থেকে। তবে কোনমতেই জায়গাটাকে সামরিক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না কেউ।

এ নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়াসহ প্রায় বিশটি দেশ সই করে তাতে। সেই থেকে বলতে গেলে সবার এজমালি সম্পত্তি ছিল স্পিটসবার্গেন। কোন ঝুট্ ঝামেলা নেই, হাঙ্গামা হুজ্জত নেই, সবাই যে যার খনি থেকে কয়লা তুলছে, দেশে পাঠাচ্ছে।

ত্রিপাঠীও শুরু করেছিল কাজ, কিন্তু ক'মাস যেতে না যেতেই অদ্ভুত এক আইডিয়া জন্ম নেয় তার মাথায়। সেটাকে ঘষেমেজে মস্কোর কাছে বিক্রি করার উদ্যোগ নেয়। আর কি ভাগ্য, টোপ ফেলতে না ফেলতে টোপ-ফাৎনা-ছিপ সবসুদ্ধ গিলে ফেলে ওরা। অবশ্য গিলবে না-ই বা কেন? সেটা এমনই এক প্ল্যান, কাজে লাগাতে পারলে মাত্র দু'বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যাবে। একটাই মাত্র পরাশক্তি থাকবে তখন বিশ্বে–সেটা হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

পাশ থেকে খুক্ করে কেশে উঠল কর্নেল। 'স্যার, সময় হয়ে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। আকাশের দিকে তাকাল। একটু পরই দেখা দেবে ওটা। তারপর…

দুই

'লংইয়ার ইনফরমেশন, দিস ইজ অ্যারোফ্লোট টু ও সেভেন,' রেডিওতে এয়ারলাইনার পাইলটের দূরাগত কণ্ঠ শোনা গেল।

সিধে হয়ে বসল নরওয়েজিয়ান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। উঠে রুমের মাঝখানের দীর্ঘ কনসোলের কাছে এসে একটা মাইক্রোফোন তুলে নিল। 'অ্যারোফ্লোট টু ও সেভেন,' জানালার কাছে দাঁড়ানো লোক দুটোর ওপর চোখ রেখে বলল সে। 'গো অ্যাহেড।'

সিভিল এভিয়েশনের ছক্ বাঁধা বুলি আওড়াতে শুরু করল পাইলট, সম্ভাব্য অ্যারাইভেল টাইম জানাল। ফলভিক জানাল বাতাসের গতি, গ্রাউন্ড টেম্পারেচার, ভিজিবিলিটি ইত্যাদি। এখানকার রানওয়ে পুবদিক থেকে প্রায় সোজা পশ্চিমে গেছে। এ মুহূর্তে বাতাস বইছে পশ্চিম থেকে। কাজেই বাতাসের বিপরীতেই ল্যান্ড করা উচিত রুশ লাইনারের, ভাবছে ফলভিক। সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু রুশরা কখনোই তা করে না। কারণ তাতে পাহাড়ঘেরা প্রশস্ত এক উপত্যকার ওপর পৌঁছে উচ্চতা কমাতে হয়। তাতে কিন্তু সমস্যা হয় না কোন, আর সব দেশের এয়ারলাইনার তাই করে। কেননা লংইয়ারবিয়েন এয়ারফিল্ডে ইন্সট্রুমেন্ট-ল্যান্ডিং সিস্টেম অত্যাধুনিক–একবারে লেটেস্ট। তারপরও রুশরা ঝুঁকি নিয়ে বাতাসের দিকে পিছন ফিরে ল্যান্ড করে। তাতে একটা সুবিধেও অবশ্য আছে, প্রশস্ত ফিওর্ডের ওপর দিয়ে পৌঁছতে অনেক কম সময় লাগে। কিন্তু ল্যান্ডিঙের সময় নিজস্ব গতি আর বাতাসের ধাক্কা সামলে উঠতে জান খারাপ হয়ে যায় পাইলটের।

'ল্যান্ডিং উইল বি অন রানওয়ে ওয়ান জিরো,' পাইলটের ব্রিটিশ উচ্চারণের ইংরেজি ভেসে এল।

'স্টেশন ম্যানেজার' ম্যাকারভের দিকে ফিরল ফলভিক। বলল, 'বাতাসের গতি বিশ নট্। অন্য মাথায় নামা উচিত টু ও সেভেনের। নইলে টাচ্ ডাউন খুব ফাস্ট হবে।'

'সেটা তাকেই ভাবতে দিন,' জবাব দিল কর্নেল। 'ঝুঁকিটা তাকে নিতে হচ্ছে, আপনাকে নয়।'

শ্রাগ করল কন্ট্রোলার। আমার কি?–ভাবল সে। পরামর্শ দেয়া দরকার, দেয়া হয়েছে। শোনা না শোনা ওদের ইচ্ছে।

'কমেন্সিং ডিসেন্ট,' পাইলট বলল। কণ্ঠে পরিষ্কার উদ্বেগ।

'নিজের ইচ্ছেমত ল্যান্ড করুন,' নিরাসক্ত জবাব ফলভিকের। 'রানওয়ে ক্লিয়ার আছে।' তার প্রথম বাক্যটা ল্যান্ডিঙের সমস্ত দায়-দায়িত্ব টু ও সেভেনের পাইলটের কাঁধে চাপিয়ে দিল। রুটিন স্লিপে সময়টা লিখে রাখল সে।

কয়েক মিনিট পর জেট বোয়িঙের গর্জন শোনা গেল রেডিও বীকনে। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর ত্রিপাঠী। নাক প্রায় জানালার সাথে ঠেকে রয়েছে। চেহারায় চাপা উদ্বেগ। টু ও সেভেনের নেভিগেশন লাইটের ঝিলিক দেখছে সে। ফিওর্ডের অন্য মাথার দিকে চলে যাচ্ছে ওটা, উচ্চতা কমে আসছে একটু একটু করে। তিন হাজার ফুটে নেমে ঘুরবে ওটা, তারপর শুরু হবে ফাইনাল অ্যাপ্রোচ। অ্যাকশন শুরু হলে যা যা ঘটবে, মনে মনে তার কাল্পনিক ছবি দেখছে প্রফেসর।

নিচের টারম্যাকের দিকে তাকাল। একজন নরওয়েজিয়ান পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। নিরস্ত্র। তার নীল ইউনিফর্ম ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুটের ভেতর গোঁজা। হাঁটতে শুরু করল লোকটা, প্রকাণ্ড খিলানের মত হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে। ওটাই টার্মিনাল বিল্ডিং হিসেবে ব্যবহার হয়। ঘুরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে দেখল সে। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বসে আছে লোকটা, শূন্য দৃষ্টিতে ফিওর্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটার সতর্কবাণী কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে দিলেও শেষ পর্যন্ত সামলে নিল ত্রিপাঠী। কিছুই ঘটবে না, ভাবছে সে, নিরাপদেই ল্যান্ড করতে পারবে টু ও সেভেন। যদি কোনরকম মিসজাজ না করে বসে পাইলট।

ফিরে আসতে শুরু করেছে লাইনার। ফ্যাকাসে আলোয় ওটার নেভিগেশন লাইটগুলোকে চলমান তারার মত লাগছে। হঠাৎ করে ল্যান্ডিং লাইট দুটোও জ্বলে

উঠল ওটার। দুটো দানবীয় চোখ যেন, মোটা বীম ছুঁড়ে খুঁজছে গ্রাস করার মত কি আছে।

'অ্যারোফ্লোট টু ও সেভেন ফাইনালস্,' উঁচু গলা শোনা গেল পাইলটের।

'রানওয়ে ইজ ফ্রী ফর ল্যান্ডিং,' সাড়া দিল ফলভিক। এই কথাটা আর কোন লাইনারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না সে, করে শুধু অ্যারোফ্লোটের বেলায়। অপ্রচলিত ইডিয়ম ওটা।

ওদিকে ত্রিপাঠী ও ম্যাকারভ রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে আলোর পিছনে প্লেনটার সুবিশাল কাঠামোর দিকে। ক্রমে আকাশ ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে ওটা। টাচ্ ডাউনের সুবিধের জন্যে শূন্যে সমান্তরাল করছে ওটাকে পাইলট। লেজের দিকটা মনে হচ্ছে যেন নিচু হয়ে আছে। ল্যান্ডিং লাইটের তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল প্রফেসরের, তবু নজর সরাবার কথা ভাবছে না সে, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে পাইলট ভুল করেছে বুঝতে পেরে দম আটকে এল তার। শেষ পর্যন্ত মিসজাজই করে বসেছে হারামজাদা, আশঙ্কা হলো ওর। একটু দেরিতে টাচ্ ডাউন করল টুপোলভ, করেই কামানের গোলার বেগে টাওয়ারের সামনে দিয়ে পুবদিকে ছুটে গেল। চোখের কোনা দিয়ে ফলভিককে ক্র্যাশ বাটনের দিকে হাত বাড়াতে দেখল ত্রিপাঠী, অসহায়ের মত রানওয়ের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। বাটন টিপে দেবে কি না বুঝতে পারছে না।

ওদিকে রিভার্সে দেয়ার ফলে ভয়াবহ গর্জন ছাড়ছে টুপোলভের তিন এঞ্জিন। ছোটখাট একটা তুষার ঝড় লেগে রয়েছে লেজের সাথে, অনুসরণ করছে প্লেনটাকে। গোটা টাওয়ার থরথর করে কাঁপছে, ঝন্‌ঝন্ করছে জানালার কাঁচ। পাইলট ঘন ঘন ব্রেক চাপছে বলে টুপোলভও কাঁপছে ভীষণভাবে।

এরমধ্যে গোটা রানওয়ে খেয়ে ফেলেছে ওটা। শেষ মাথার ঢালের দিকে ছুটছে এখন কাঁপতে কাঁপতে। ঢাল নেমে গেছে ফিওর্ডে–ওয়েইস্ট ল্যান্ড ওটা। বিপর্যয়টা বোধহয় ঠেকানো গেল না ভেবে শক্ত হয়ে উঠল প্রফেসর। এত যত্নের প্ল্যান শেষ মুহূর্তে এভাবে কেঁচে যাচ্ছে দেখে মাথা বিগড়ে গেল। দু'হাত শক্ত মুঠো পাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'স্টপ্! স্টপ্! হারামজাদা মাথামোটা…!'

ওদিকে কর্নেলের দেহ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। গাল, চোখের কোণ কুঁচকে আছে। ঠোঁট সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে। গেল! ভাবছে সে, দুর্ঘটনা ঘটলে তদন্ত হবে, ফাঁস হয়ে যাবে সব। তারপর…সারা দুনিয়া ছি ছি করবে।

অন্যদিকে ফলভিক আর উপায় নেই দেখে বাটনে তালুর চাপ বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ পাল্টে গেল পরিস্থিতি। দানবটাকে মোটামুটি বাগে নিয়ে এল পাইলট, রানওয়ের একদম প্রান্তে কড়া ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে ফেলল। শক্তিশালী স্প্রিঙের ধাক্কায় সামনের দিক বেশ খানিকটা নিচু হয়েই দোল খেয়ে উঠে পড়ল ওটার নাক। এঞ্জিনের ভয়াবহ হুঙ্কার থেমে গেল চট্ করে, অলসভঙ্গিতে ঘুরে এ-মুখো হলো টুপোলভ। চেপে রাখা দম একসাথে ছাড়ল ত্রিপাঠী ও ম্যাকারভ।

ফলভিকও। বাটন থেকে হাত সরিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'গিয়েছিল আরেকটু হলে!'

'আমার তা মনে হয় না,' আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে মাথা নাড়ল কর্নেল ম্যাকারভ। 'আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের পাইলটরা শুধু পৃথিবীর সেরা নয়, সবচেয়ে অভিজ্ঞও।'

ঘুরে টাওয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল প্লেন, এয়ারফিল্ডের কর্মচারীরা গ্যাংওয়ে নিয়ে ছুটল ওটার দিকে। টাওয়ারে উপস্থিত অপর দু'জনকে দেখল ফলভিক, নিচু গলায় কি যেন বলছে বয়স্ক মানুষটা, 'স্টেশন ম্যানেজার' তার প্রতিটা কথায় মাথা দুলিয়ে সায় দিচ্ছে। কি বলছে মাইনার? ভাবল সে। তাকে এত হুজুর হুজুর করছে কেন লোকটা?

ওদিকে অ্যারোফ্লোটের গায়ে ভিড়েছে গ্যাংওয়ে। চারজন দাঁড়িয়ে আছে ওটার গোড়ায়। তাদের দু'জন নরওয়েজিয়ান পুলিস, একজন এয়ারপোর্ট কমানড্যান্ট, এবং শেষেরজন ম্যাকারভের সহকারী। এয়ারলাইনারের দরজা একটু খুলল, তারপর পুরোটা। এক সুন্দরী স্টুয়ার্ডেস দেখা দিল দোরগোড়ায়, ম্যাকারভের সহকারীর উদ্দেশে কিছু বলল। এর একটু পর দোরগোড়ায় দেখা দিল প্রথম 'যাত্রী'।

গাঢ় রঙের পুরু কোট পরা। তার পিছনে একই পোশাকের আরও কয়েকজন বের হলো। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। দেখতে সাধারণ মনে হলেও ওরা আসলে অসাধারণ। পৃথিবীর সেরা সৈনিক–স্পেৎসনাজ। সবচেয়ে কঠোর ট্রেনিং পাওয়া, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল এবং নির্দয়, রুশ প্যারাট্রুপার।

টাওয়ারের ভেতরে কোন শব্দ আসছে না বাইরে থেকে। প্রফেসর ত্রিপাঠীর মনে হচ্ছে মূক ছায়াছবি দেখছে সে। যার চিত্র-নাট্যকার সে নিজে।

কোট পরা ডজনখানেক যাত্রী নেমে এসে নিচের তিন নরওয়েজিয়ানকে সুকৌশলে ঘিরে ফেলল। তারপরই শুরু হলো আসল খেলা। সোভিয়েত বর্ডার পুলিস ট্রুপের এক ফুল ইউনিফর্মড্ অফিসার দেখা দিল দোরগোড়ায়, এক মুহূর্তও দেরি না করে নেমে আসতে শুরু করল সে। তার পিছনে একদল পুলিস। মিলিটারি গ্রেটকোটের ওপরে লেদার বেল্ট ও হোলস্টার পরে আছে তারা। এয়ারপোর্ট কমান্ড্যান্টকে বেষ্টনী ভেঙে বের হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখল প্রফেসর। মানুষটার চেহারায় ও হাত নাড়ায় প্রতিবাদের ভাষা, কিন্তু দৃঢ়ভাবে থামিয়ে দেয়া হলো লোকটাকে। তার অর্থহীন আস্ফালন দেখে হাসল সে।

এদিকে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে ছিল এয়ার কন্ট্রোল অফিসার ফলভিক। হঠাৎ সচকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কি হচ্ছে এসব? কারা এসেছে ওই প্লেনে?'

স্রোতের মত বর্ডার ট্রুপস নামছে টুপোলভের পেট থেকে, জগিং করতে করতে নিচে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে তারা। ওদিকে দুই নরওয়েজিয়ান পুলিসকে দু'দিক থেকে ধরে রেখেছে 'যাত্রীরা'। জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

'এ অন্যায়!' উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফলভিক। 'এখানে সৈন্য পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে আপনার দেশ। চরম অন্যায় করেছে। আমি সিসেলম্যানকে রিপোর্ট করতে যাচ্ছি এখনই।'

তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল প্রফেসর। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তাই করুন, প্লীজ। তাঁকে এখনই এখানে আসতে বলুন। আমি কথা বলব তাঁর সাথে।'

'আপনি!' বিস্ময় ফুটল ফলভিকের চেহারায়। 'আপনি কে? গভর্নর আপনার সাথে কেন...'

'কারণ ইনিই সব,' ম্যাকারভ থামিয়ে দিল লোকটাকে। হাত ইশারায় পিছনের এয়ার ফিল্ড দেখিয়ে বলল, 'ওখানে এখন যা ঘটছে, সব এঁর পরামর্শেই ঘটছে। তাই আপনার গভর্নরকে এঁর সাথেই কথা বলতে হবে।'

'আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না আমি।' একটু একটু কাঁপছে নরওয়েজিয়ান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। 'কি ঘটছে এসব?' আতঙ্কিত চোখে বাইরে তাকাল। ফিল্ডে ছোটাছুটি করছে রুশ বর্ডার পুলিস বাহিনীর সদস্যরা। এখানে-সেখানে পজিশন নিতে শুরু করেছে। সবার হাতে অত্যাধুনিক রাইফেল। তাদের অ্যাকশন দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে সবকিছু।

'এখনও কিছুই ঘটেনি,' ম্যাকারভ বলল। 'আপনি যা দেখছেন, তা কেবল সূচনা। আসল ঘটনা একটু পর ঘটবে। আপনি গভর্নরকে ফোন করুন এখনই,' তার ডেস্কের ওপরের দুটো টেলিফোনের একটা নির্দেশ করল সে। ওটা সরাসরি গভর্নরের অফিসের সাথে সংযুক্ত, জানা আছে তার। 'দ্যাট'স অ্যান অর্ডার!'

কাঁপা হাতে রিসিভার তুলল ফলভিক। 'কি...মানে, কি বলব তাঁকে?'

ব্যাটার ফোলা গালে কষে এক চড় মারতে ইচ্ছে হলো কর্নেলের। কিন্তু সামলে নিল। 'বলবেন, সোয়ালবারের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন নরওয়ের সাথে জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী। রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে...'

চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো লোক দুটোকে দেখছে পালা করে। হঠাৎ কথাটার ভেতরের অর্থ ধরতে পারল সে, রাগ ফুটল চেহারায়। বুক টান করে দাঁড়াল। 'এটা আমাদের দেশ, মিস্টার! রাশিয়ার সাথে কোন রকম "জয়েন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" গড়ার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের।'

'ভুল বললে, বন্ধু,' হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। আড়চোখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বিকার প্রফেসর ত্রিপাঠীকে দেখে নিল। 'এখানে আমরা মেজরিটি। তেইশশো রুশ মাইনার। নরওয়েজিয়ান আছে মাত্র এগারোশো। নাকি আজকাল গণতন্ত্রে আর আস্থা নেই নরওয়ের?'

'ভূতের মুখে রাম নাম?' বলল ফলভিক। 'সোয়ালবার ট্রীটি...'

'ওটা পাঁচ দশকের পুরনো,' বাধা দিল কর্নেল। 'অচল হয়ে গেছে। আমার দেশ নতুন ট্রীটি স্বাক্ষরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সে যাক্, আপনি খবরটা জানাবেন গভর্নরকে, না আমি জানাব?'

বেশ সময় নিয়ে কাজটা করল ট্রাফিক অফিসার। তারপর রিসিভার ক্রেডলে রেখে হাতের উল্টোপিঠ কপালে বোলাল। এত শীতেও ওখানে একটু একটু ঘাম জমেছে টের পেয়ে অবাক হলো সে।

'আধ ঘণ্টা পর আরও দুটো প্লেন আসছে আমাদের,' তাকে সামলে ওঠার

সময় দিয়ে বলল কর্নেল, 'ওগুলোর ল্যান্ডিঙের ব্যাপারে অ্যাবসোলিউট প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনাকে। মনে রাখবেন, আপনি যতক্ষণ আমাদেরকে সহযোগিতা দেবেন, ততক্ষণ আমরাও আপনাকে সহযোগিতা দিয়ে যাব।'

বক্তব্য শেষ করে সমর্থনের আশায় প্রফেসরের দিকে তাকাল লোকটা। সব কথা ঠিকঠাক মত বলা হয়েছে কি না জানতে চায়। মাথা সামান্য নেড়ে সমর্থন জানাল ত্রিপাঠী।

মনে মনে হাসছে। ছয় মাস আগে ঠিক যেভাবে যা ঘটবে ভেবেছিল, সেভাবেই ঘটছে সব। মস্কোকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে সে। এখন আর একটা কাজ শুধু বাকি, ওটা শেষ হলেই বাকি টাকাটা পেয়ে যাচ্ছে। তারপর ছুট্টি।

তিন

ব্রাসেলস হিলটন। রিসেপশন রুমের বারম্যানরা আজ জিনস, কাউবয় শার্ট এবং স্টেটসন হ্যাট পরেছে। কোমরের বেল্টে হোলস্টার, তার মধ্যে নকল কোল্ট। এর কারণ, আজকের রাত 'স্টেট অভ জর্জিয়া' হিসেবে পালন করছে হিলটন। সারা হলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিজনেস গেস্টদের স্কচ আর বারবন পরিবেশন করছে বারম্যানরা।

হলের এক প্রান্তে একটা নিচু স্টেজ, তার ওপর স্কারলেট ও'হারা সেজে দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকান এক সুন্দরী। শুধু সুন্দরী নয়, খুবই সুন্দরী সে। ধপধপে সাদা ক্রিনোলাইন স্কার্টে তার রূপ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রক-কোট পরা রেট-বাটলার।

'আমাদের চেয়ে ও দুটোকে আরও বড় আহাম্মকের মত লাগছে,' এক বারম্যান আরেক বারম্যানের উদ্দেশে ফিস্‌ফিস্ করে বলল। 'কি বলো?'

'গর্দভের মত লাগছে,' জবাব দিল এরিক ব্রাউন। কাউবয় গিয়ারে ভীষণ অস্বস্তি লাগছে তার। কিন্তু এসব নিয়ে এ মুহূর্তে আলোচনা করতে চায় না। কিছুই করতে রাজি নয় সে এখন, স্রেফ তথ্য জোগাড় করা ছাড়া। এ ধরনের পার্টিতে কান খাড়া রাখলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

একটু পর স্টেজে উঠল গেস্ট অভ অনার, মার্কিন রাষ্ট্রদূত। বিশালদেহী মানুষ। নীল সুটে তাকেও ভালই মানিয়েছে ও'হারার পাশে। তার দিকে তাকিয়ে গালে টোল ফেলে হাসল মেয়েটা। 'আশা করি আপনার লাইব্রেরির জন্যে এই স্মারক স্মৃতিটি গ্রহণ করে আমাদেরকে ধন্য করবেন, স্যার,' একটা বই এগিয়ে দিল।

নিল ওটা রাষ্ট্রদূত, একটু ইতস্তত করে ও'হারার গালে চুমু খেল। 'আজ এখানে আমাকে যে অবিশ্বাস্য সম্বর্ধনা দেয়া হলো,' বলল লোকটা। 'তার কথা সারাজীবন মনে থাকবে আমার। আমি কৃতজ্ঞ।' হাততালির শব্দে মুখর হয়ে উঠল হল। ওর মধ্যেই ভাষণ দিয়ে চলল রাষ্ট্রদূত: 'এখানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে

ধন্য মনে হচ্ছে আমার।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের মধ্যেকার দৃঢ় বন্ধুত্ব...'

অডিয়েন্সের ওপর সতর্ক নজর রেখেছে এরিক ব্রাউন। সিল্কের ড্রেস পরা এক মোটা, বয়স্ক বেলজিয়ান মহিলাকে টেবিল থেকে সন্তর্পণে এক টুকরো স্ট্রবেরি ফ্ল্যান তুলে সবার অলক্ষে দ্রুত মুখে পুরতে দেখে হাসল মনে মনে। লোভ, ভাবল সে, বয়স বাড়লে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই জিনিসটার বাড়াবাড়ি দেখা দেয়।

রাষ্ট্রদূতের দীর্ঘ ভাষণ শেষ হলো এক সময়, 'গন উইদ দা উইন্ড' জুটি বিদেয় নিল ওয়ালযের তালে তালে, তারপর শুরু হলো ডিনার। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই নার্ভাস হয়ে উঠছে এরিক ব্রাউন। সান্ড্রা তার অপেক্ষায় আছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলে না গেলে হয়। থাকবে তো মেয়েটা? যন্ত্রের মত এক কূটনীতিকের গ্লাসে বারবন ঢালতে ঢালতে ভাবল, ওর দেরি দেখে চলে যাবে না তো?

নিশ্চয়ই না। ও থাকবে, যাবে না। কারণ সান্ড্রাও ওই মোটা মেয়েছেলেটার মত লোভী। অবশ্য খাওয়ার বেলায় নয়, এখনও ওর সে বয়স আসতে অনেক দেরি আছে। সান্ড্রার একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে এরিক ব্রাউন। তাকে ছাড়া ইদানীং আর কিছু ভাবতেই পারে না মেয়েটা। বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।

মনে মনে হাসল এরিক; পাগল আর কাকে বলে!

ঠিক আটটায় ডাক ডি আরেনবার্গ রেস্টুরেন্টে পা রাখল সান্ড্রা কারমেন। পরিচিত, প্রায় নিয়মিত খদ্দেরটিকে দেখে হাসিমুখে বাউ করল ম্যানেজার। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল নির্দিষ্ট টেবিলের দিকে। মেয়েটা বসতে মৃদু গলায় বলল, 'ভায়োলা, ম্যাডাম। ড্রিঙ্কস্?'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' হেসে মাথা দোলাল সান্ড্রা। লোকটার অপসৃয়মাণ পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাক ডি আরেনবার্গ তার খুব প্রিয়। এখানকার পরিবেশ খুব আপন মনে হয়। রান্নাও চমৎকার। জায়গাটা রয়্যাল প্যালেসের কাছের এক নির্জন রাস্তায়। হিলটন থেকে হেঁটে আসতেও মাত্র দশ মিনিট লাগে। এরিকের সুবিধে হয়। ওর সুবিধের জন্যেই এই রেস্ট্রন্ট বেছে নিয়েছে সান্ড্রা। হিলটনে থাকে সে।

ম্যানেজার ফিরে এল তার পছন্দের পানীয় মাসকাডেট ওয়াইন নিয়ে। গ্লাসটা টেবিলে রেখে সান্ড্রার হাতে মেন্যু তুলে দিল। কিন্তু ওটা একপাশে সরিয়ে রাখল সে। 'আমার ফ্রেন্ড এলে অর্ডার দেব।'

'নিশ্চই, ম্যাডাম।' সরে এল ম্যানেজার, এমন এক জায়গায় দাঁড়াল যেখান থেকে মেয়েটাকে ভাল করে দেখা যায়। মেয়েটা ইংরেজ, ম্যানেজার জানে। ধারণা, বয়স তেত্রিশ পেরিয়েছে। এই বয়সের রমণীদের কি বলে যেন ইংরেজরা? ইংলিশ রোজ না? হ্যাঁ, তাই। তবে এই ফুলটি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারাতে বসেছে, ভাবল সে। পাঁচ-দশ বছর আগে যে সম্পদ ছিল, তার কিছুই প্রায় নেই। যৌনাবেদন বলে কী একটা থাকে মেয়েদের মধ্যে, তাও নেই। তারওপর চেহারাও সাদামাঠা।

তাহলে ওর চেয়ে অল্পবয়সী ওই জার্মান ছোকরা কি দেখে মেয়েটার পিছনে লেগে আছে? শুধুই শরীরটার লোভে? মেয়েটার ফিগার আছে তাতে কোন সন্দেহ

নেই, কিন্তু যৌবন…শ্রাগ করল ম্যানেজার। অন্ধকারে সব বেড়ালকেই কালো মনে হয়।

সে জানে ন্যাটো হেডকোয়ার্টার্সে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করে মেয়েটা। বেতনও নিশ্চয়ই ভাল পায়। হিলটনের এক বারম্যানের সাথে মেয়েটির এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক…এরিক কোথায় চাকরি করে, একদিন দুর্ঘটনাবশত ব্যাপারটা জানতে পেরে খুবই বিস্মিত হয়েছিল সে। কে যেন তাকে বলেছিল লোকটা ফ্রী-ল্যান্স সাংবাদিক। খবরটা মিথ্যে প্রমাণ হওয়ায়…এরিক ব্রাউনকে দেখে সোজা হলো সে। সিল্ক্ টাই আর কার্ডরি জ্যাকেটে লেখকের মত দেখাচ্ছে ছোকরাকে। 'গুড ইভনিং, স্যার!' এগিয়ে এসে বলল ম্যানেজার। যদিও খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। বারম্যান তো বারম্যানই, সে যতবড় হোটেলেরই হোক না কেন। 'ম্যাডাম আপনার অপেক্ষায় আছেন।'

দ্রুত পায়ে সান্ড্রার কাছে এসে দাঁড়াল যুবক। তার হাতে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, ডার্লিং। কাজে আটকে গিয়েছিলাম।'

'ও কিছু নয়,' হাসল সান্ড্রা। 'বেশিক্ষণ হয়নি আমি এসেছি।'

ম্যানেজারকে সিনয়ানো আর সোডার অর্ডার দিল এরিক। এ সময় হুইস্কি হলেই ভাল হত, কিন্তু বেলজিয়ান হুইস্কির দাম বেশি মনে হয় তার। এক বোতল কিনতে গেলে একদিনের রাহাখরচের অর্ধেকই বেরিয়ে যায়। তাই কিনে খায় না সে। দরকারও পড়ে না। ন্যাটো কমিশারি থেকে তার জন্যে দামী দামী ব্রিটিশ, আমেরিকান ডিউটি ফ্রী হুইস্কি কিনে রাখে সান্ড্রা। রাতে ওর অ্যাপার্টমেন্টে দেদারসে তাই গেলে।

'আজ দেরি হলো কেন, ডার্লিং?' যুবকের হ্যান্ডসাম চেহারার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে সান্ড্রা। এমন এক সুদর্শন, সুপুরুষ তার বয়ফ্রেন্ড, ভাবলেই দেহমনে পুলক জাগে। তাকে রোজই কাছে পায় সে, কিন্তু তাতে ওর মন ভরে না। বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত ভরবেও না। যত ইয়েই হোক না প্রতিদিন।

'আর বোলো না,' চোখেমুখে বিরক্তি ফোটাল এরিক। 'বড় এক পার্টি কাভার করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ম্যাগাজিনের সম্পাদক বলল, আর কি। যাচ্ছেতাই! এমন বোরিং, কি বলব! দুটো ঘণ্টা…'

'আহা, বেচারী!' চোখমুখ করুণ হয়ে উঠল সান্ড্রার। ইচ্ছে হলো এখানেই একটু আদর করে প্রেমিককে।

'ভেবো না,' এরিক বলল। 'আগামী মাসে ডের স্পিগেলে একটা ফিচার রাইটারের পদ খালি হচ্ছে। তখন এইসব ছোটখাট ম্যাগাজিনে আর থাকছি না আমি। সে যাক্, এখন বলো কি অর্ডার দেয়া যায়,' বলে স্বর নামাল সে। 'এমনিতে আজ দেরি হয়ে গেছে। বেশি খাওয়া ঠিক হবে না, কি বলো?'

ব্লাশ করল সান্ড্রা। দৃষ্টি নত হয়ে এল আপনাআপনি। 'হ্যাঁ।'

'স্টুপিড বিচ্,' ভাবল এরিক ব্রাউন। ন্যাকামো! 'তোমার চুলে সোনালী রং করালে কেমন হয়? আমার তো মনে হয় চমৎকার লাগবে।'

'সত্যি?' আবার ব্লাশ করল মেয়েটা। 'কিন্তু অফিসের সবাই কি বলবে কে জানে!'

'কি বলবে মানে? তুমি না বলেছিলে তোমার বস্ জেনারেল অ্যান্ডারসন ব্লন্ড মেয়েদের পছন্দ করে?'

'তা করে,' মাথা ঝাঁকাল সান্ড্রা। 'কিন্তু তার জন্যে কেন ও-কাজ করতে যাব? করলে তোমার জন্যে করতে পারি।'

'ঠিক আছে। তাহলে তাই করো।'

'অবশ্যই!' বলল সান্ড্রা। 'জানো, এরিক, তোমার সাথে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় আমার।'

মাথা নাড়ল যুবক। 'না, মাই লাভ। বরং আমারই নিজেকে ধন্য মনে হয়।'

ওয়েটার এসে অর্থহীন প্যানপ্যানানির হাত থেকে উদ্ধার করল তাকে। খাওয়ার ফাঁকে অন্য বিষয় তুলল সে। 'তোমার অফিসের খবর কি? আজ নিশ্চই খুব ব্যস্ত দিন গেছে?'

'হ্যাঁ। খুব অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে।'

'শুনলাম রুশরা নাকি সোয়ালবার ছেড়ে যাওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে?' বলল এরিক। 'রয়টার দিয়েছে খবরটা। আমি অবশ্য ওটা কব্জা করার সুযোগ পাইনি। অন্য এক ফ্রী ল্যান্সার আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। ছোটখাট মিডিয়ায় কাজ করার এই হচ্ছে এক যন্ত্রণা। অল্প পয়সায় যার-তার কাছ থেকে খবর কেনে ওরা।'

'অর্থাৎ এই খবরের বিনিময়ে তুমি কিছু পাচ্ছ না তোমার ম্যাগাজিন থেকে?'

'পাব কি করে? আমার আগেই তো আরেকজন পাঠিয়ে দিয়েছে।'

সহানুভূতির চোখে এরিককে দেখল সান্ড্রা। 'তোমার এডিটর এ ব্যাপারে জানতে আগ্রহী?'

শ্রাগ করল যুবক। 'জানি না। তবে আগ্রহী হবে না-ই বা কেন? হাজার হোক, পত্রিকার এডিটর তো!'

'কিন্তু তোমাদের মিউনিখ তো আর্কটিক থেকে অনেক দূরে।'

'তা হোক,' মাথা দোলাল জার্মান। 'এটা কি যা-তা খবর? কানাঘুষায় শুনলাম, ন্যাটো নাকি এরইমধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে খাড়া হয়ে গেছে! আমার তো মনে হয় এই ঘটনা মেজর কনফ্রন্টেশনের জন্ম দেবে রাশিয়া আর ন্যাটোর মধ্যে।'

মাথা দোলাল সান্ড্রা। 'হ্যাঁ! তা হয়তো দেবে।'

'বোঝো তাহলে!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এরিকের। 'এরকম মুহূর্তে যদি এখানকার ভেতরের দু'চারটে খবর আগেভাগে পেয়ে যাই, তাহলে আমার, আই মীন, আমাদের ভবিষ্যৎ···তুমি বুঝতে পারছ তো আমি কি বলতে চাইছি, ডার্লিং? আমি অবশ্য বলছি না তুমি এমন কিছু করো যাতে তোমার ক্ষতি হয়। তেমন কিছু কিছুতেই চাইব না আমি।'

ইচ্ছে করেই কিছু সময়ের বিরতি দিল সে। কয়েক চামচ বীফ আর জ্যাকেট পটেটো মুখে পুরে ওগুলোকে বাগে এনে শুরু করল আবার। 'তবে কথা হলো, এ ব্যাপারে কিছু স্কুপ নিউজ যদি ওদেরকে দিতে পারি, তাহলে নিশ্চই ডের স্পিগেলের চোখে পড়ে যাব আমি। তখন ওরাই খুঁজে নেবে আমাকে। বিয়েটা

তাহলে বেশ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারব আমরা।'

'কিন্তু, ডার্লিং, এ ব্যাপারে আমি নিজেও ঠিকমত কিছু জানি না,' সান্ড্রা বলল। 'এমন কি সোয়ালবারের নামটাও আজই প্রথম শুনলাম। তুমি ন্যাটো প্রেস অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে ভাল হত না?'

বেশ্যা মাগী! মনে মনে বলল এরিক। 'ন্যাটো! করেছিলাম। ওরা কোনও মন্তব্য করতে রাজি নয়।'

'কিন্তু আমি সত্যি বলছি, এখনও ব্যাপারটা সম্পর্কে ভালমত কিছুই জানতে পারিনি আমি।'

'আহা, ঠিক আছে!' তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল এরিক। 'আজই জানতে হবে, এমন কথা কখন বললাম আমি? আজ না হোক কাল জানতে পারবে। কাল না হোক পরশু। আফটার অল, তুমি ন্যাটো মিলিটারি কমিটির চেয়ারম্যানের অন্যতম পি.এ। তোমাকে তো জানতেই হবে।'

কিছু বলল না সান্ড্রা। খাওয়া থামিয়ে চুপ করে কি যেন ভাবছে। তার চোখে মুখে অজানা ভাবের ছায়া দেখে মনে মনে ঘাবড়ে গেল এরিক। বুঝল, বেশি চাপাচাপি হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'এই দেখো, ফালতু কথায় সময় নষ্ট করছি আমরা। এদিকে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নাও, নাও। খেয়ে নাও! তারপর? নতুন ওয়াল পেপার লাগিয়েছ অ্যাপার্টমেন্টে?'

এক ঘণ্টা পর। সান্ড্রার চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের বেডরূমে ক্লান্ত দেহে শুয়ে আছে এরিক ও সান্ড্রা। প্রেমিকের বাহুতে মাথা রেখে চোখ বুজে আছে তৃপ্ত মেয়েটা, ঘুম পাচ্ছে খুব। একটু একটু ভারী হয়ে উঠছে নিঃশ্বাস। এই সময় আবার পুরানো প্রসঙ্গ তুলল যুবক। মৃদু কণ্ঠে নিজের জীবন ও লক্ষ্যের কথা বলল, কাল্পনিক ব্যবসায় বাবার শেষ সম্বল পেনশনের কয়েক হাজার মার্ক খুইয়ে কিভাবে মাসের পর মাস অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে বেঁচে থাকার জন্যে নতুন একটা সম্বল খুঁজে বেড়িয়েছে, বেশ ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল এরিক।

সান্ড্রার খেয়াল হলো, কখন যেন অজান্তেই উঠে বসেছে সে। এরিকের 'দুঃখের' কাহিনী শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে। 'তোমার বাবা এখন কি করেন? মানে ওদের সংসার...' কান্নায় গলা বুজে এল তার। প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না।

ওকে আড়াল করে চোখ মটকাল এরিক। মনে মনে হেসে খুন। 'বাবা? বেঁচে নেই। ওই টাকার শোকে...' ইচ্ছে করে কথা অসমাপ্ত রাখল।

'মা?'

'মা আছে। মিউনিখে। তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়।' চালিয়ে গেল সে, যদি এই পুব-পশ্চিম ক্রাইসিস নিয়ে কয়েকটা স্কুপ নিউজ করতে পারে, তাহলে হয়তো দিন ফিরবে। হয়তো কেন, অবশ্যই ফিরবে। ডের স্পিগেলের চাকরিটা পেলে বার্লিনে থাকার সুযোগ পাবে, মায়ের যত্ন নিতে পারবে। সান্ড্রারও ভাল লাগবে ওখানে। না লেগেই পারে না, কারণ বার্লিনের মত সুন্দর শহর ইওরোপে খুব কমই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে

কাদার দলায় পরিণত করল 'প্রেমিকা'কে।

বিশ্ব রাজনীতির এই সন্ধিক্ষণে সে কি পারে না তার প্রেমিককে একটু সাহায্য করতে? প্রশ্ন করল এরিক ব্রাউন। পারে না তাকে উন্নতির সিঁড়ির ধাপে খানিকটা তুলে দিতে? সোয়ালবারের ব্যাপারে ন্যাটো কি ভাবছে, কি করতে যাচ্ছে, জানতে ওকে সাহায্য করতে পারে না?

কথার ফাঁকে ফাঁকে আবার সান্ড্রাকে জাগিয়ে তুলল সে। আধঘণ্টার জন্যে ছেদ পড়ল 'আলোচনায়', তারপর ফের শুরু করল এরিক। সান্ড্রা কিছু বলতে পারল না। অতিসুখে ক্রমাগত কেঁদে চলল। একটা ব্যাপারে মেয়েটা একদম নিশ্চিত, এই বয়সে ঈশ্বরের দয়ায় অপ্রত্যাশিতভাবে এরকম একজন সাচ্চা প্রেমিক জুটে যাওয়া রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাকে কিছুতেই হারাবার ঝুঁকি নেবে না সে।

মনে মনে এরকম একজন জীবন সঙ্গীর অপেক্ষাতেই তো ছিল সে। এরকম হ্যান্ডসাম, উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর ভাবপ্রবণ একজনের স্বপ্নই তো জীবনভর দেখেছে সে। তাহলে আজ কেন পেয়েও তা নেবে না সে?

ভাবনাচিন্তা দ্রুত সেরে ফেলল সান্ড্রা। ঠিক করল, কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ করবে সে এরিককে, তবে ভাইটাল কিছু দেবে না। ন্যাটো প্রেস সাংবাদিকদের যা জানাবে, তার চেয়ে সামান্য কিছুটা বেশি জানাবে। তার বেশি নয়। ডিসিপ্লিন অভ সিকিউরিটি সম্পর্কে সর্বোচ্চ ট্রেনিং নেয়া আছে তার। কাজেই এমন কিছু করবে না যাতে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হয়।

সরাসরি কিছু না বলে এটা-সেটা সম্পর্কে এরিককে আভাস দেবে সে, কোন গোপন তথ্য দেবে না। কোন মিলিটারি সিক্রেটস তো অবশ্যই না। অবশেষে প্রেমিককে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল সান্ড্রা। উত্তেজনায় উঠে বসল এরিক। 'সত্যি?'

'নিশ্চই!'

'ওহ্, ডার্লিং! ওহ্, ডার্লিং! দাঁড়াও, কালই মাকে তোমার কথা জানিয়ে মিউনিখে চিঠি লিখছি। ছেলের বউ সম্পর্কে আগাম জানিয়ে রাখি।'

মা তার আছে বটে, তবে পশ্চিম জার্মানিতে নয়, পুব জার্মানিতে থাকে সে। চাকরি করে সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা স্টাটসিশের হেইটসডিয়েন্টস বা স্টাসিতে। ছেলেও তাই। প্রয়োজন পড়বে বলে আগে থেকেই এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে সে কেজিবির নির্দেশে। বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফাঁদে ফেলেছে মেয়েটাকে। প্রেমে অন্ধ সান্ড্রা অবশ্য অনেক দেরিতে জানল সে খবর।

সোয়ালবার বেদখল হওয়ার তিন ঘণ্টা পরের কথা।

নিজের শানদার মাইনিং অফিসে বসে আছে প্রফেসর ত্রিপাঠী। একা। সারামুখে পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি। সামনের হাল্কা ক্রীম রঙের দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার ওপর চাউনি স্থির। সোনালী রঙের সরু সেকেন্ডের কাঁটার সাথে ঘুরছে। সুইপিং কাঁটা। ঝাঁকি খায় না, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না, মসৃণ গতিতে একনাগাড়ে চলে।

ভাগ্যে বিশ্বাস নেই প্রফেসরের। তার মতে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য হচ্ছে দুর্বলদের কথা, তার মত করিৎকর্মাদের কাছে ওসবের কোন মূল্য নেই। কোন কাজে উন্নতি করতে চাইলে সময়োচিত, হিসেবী পদক্ষেপ, একটু কৌশল, প্রয়োজনে একটু নির্দয় হওয়া, এরকম কিছু নিয়ম মেনে চললেই আর ওসবের তোয়াক্কা করতে হয় না। সাফল্য আসবেই।

যেমন এসেছে এখানকার বেলায়। অবশ্য 'এসেছে' বললে ভুল হবে। সেধে আসেনি এ সাফল্য, তাকে ম্যানেজ করে আনতে হয়েছে। প্রচুর মাথা খাটাতে হয়েছে এজন্যে। অনেক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এতবড় একটা কাজে সফল হওয়া কি মুখের কথা নাকি?

সোয়ালবারে যখন প্রথম আসে, তখনকার কথা ভাবল সে। সান ফ্রান্সিসকোয় ছিল সে, বড় এক দাঁও মারার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিল, এমন সময় হঠাৎ করে শুভকাজে বাঁ হাত দিয়ে বসল তার চিরশত্রু। কাজ তো গেলই, প্রাণটাও আরেকটু হলে গিয়েছিল সেই ধাক্কায়। বাধ্য হয়ে চেনাজানা জগৎ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হলো তাকে।

কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে স্পিটসবার্গেনে থানা গাড়ল সে। ছোটখাট এক মাইনিং কোম্পানি খুলে বসল। প্রথমদিকে এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না তার, যতদিন আর কোন ব্যবস্থা করতে না পারছে, ততদিন ব্যবসা করেই কাটানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওই যে কথায় বলে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে,' সেটা তার বেলায়ও সত্যি হলো।

এখানে ব্যবসা হয় মূলত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, ব্যক্তিগত পর্যায়েও হয়, তবে কম। কাজে নেমে এইসব প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের পরোক্ষ শত্রুতে পরিণত করল সে নিজেকে। তাকে ভাগিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগল তারা, নানা উপায়ে বাধা দিতে লাগল। আসল সমস্যায় পড়ল প্রফেসর খনি শ্রমিক নিয়ে। বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে নরওয়ে থেকে যে সমস্ত শ্রমিক জোগাড় করে নিয়ে আসে, কয়েকদিন যেতে না যেতে কিছু বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে তাদের ভাগিয়ে নিয়ে যায় অন্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলো।

মাত্র দু'মাসে পরিস্থিতি এমন তিক্ত পর্যায়ে পৌঁছল যে উপায় নেই দেখে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হলো সে। ওদেশের পলিট ব্যুরোর কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যের সাথে পুরনো সম্পর্ক ঘষেমেজে নতুন করে নিল অল্পদিনের মধ্যে। সোয়ালবার আর্কিপেলাগোর নিরাপত্তার ব্যাপারে যে গলদ আছে, ততদিনে তা জানা হয়ে গেছে তার। বিশ্বের সামরিক শক্তির ভারসাম্য টলিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে জায়গাটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও আর অজানা নেই। ফলে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ভেতরে ভেতরে নাড়াচাড়া করতে লাগল ওটাকে।

প্রথমে রুশ বন্ধুদের সাহায্য চাইল সে, তারা করল। দলে দলে রুশ খনি শ্রমিক এসে যোগ দিল তার কোম্পানিতে। নরওয়েজিয়ানদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক পারিশ্রমিকে কাজ শুরু করল। তাদের পক্ষ বদলের কোন প্রশ্নই আসে না, এটা হলো ত্রিপাঠীর প্রথম লাভ। দ্বিতীয়টা হলো রুশ শ্রমিকরা খুবই পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু। নরওয়েজিয়ানদের তুলনায় অনেক বেশি কাজ করে অভ্যস্ত। ফলে

অল্পদিনেই বাকি সব প্রাইভেট মাইনিং কোম্পানি পিছনে পড়ে গেল। অল্পদিনেই তাদের ফেলে অনেক মাইল এগিয়ে গেল সে। জমে উঠল ব্যবসা।

আরও একটা কাজ করল সে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে। স্পিটসবার্গেনে যে জিনিস ছিল না, সেই রাগবি ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করল। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্যে নগদ পুরস্কার ও ট্রফির ব্যবস্থাও করল সে। ফুটবল আগেও খেলা হত এখানে, কিন্তু কোন টুর্নামেন্ট হত না। এ কাজ করায় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল প্রফেসর। কয়েক মাসের মধ্যে জমে উঠল রাগবি খেলা। গত দু'বছরে আটটা টুর্নামেন্ট হয়েছে, তার পাঁচটায় জিতেছে তার দল। দু'বার জিতেছে নরওয়ে, একবার জার্মানি।

নিজের অবস্থান ভালমত পোক্ত করে পরবর্তী কাজে হাত দিল ত্রিপাঠী। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও খনির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তার প্রধান সাহায্যকারী, রুশ সমর মন্ত্রী জেনারেল বরিস ইভানোভিচ স্টোলিপিনকে অচিন্তনীয় এক প্রস্তাব দিয়ে বসল। লোকটা সে সময় বাৎসরিক ছুটি ভোগ করছিল নিজস্ব দাচায়।

ছোটখাট মানুষ। বয়স পঁয়ষট্টির মত। সারা দেহ বনমানুষের মত লোমে ঢাকা। ভুরু জোড়া শুঁয়োপোকার মত মোটা, খুব ঘন। চোখ ছোট ছোট, তবে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। বিপত্নীক। ছেলেমেয়েও নেই। একদম ঝাড়া হাত-পা।

প্রস্তাব শুনে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝলাম না।'

'বলছি, ধরো যদি এমন হয়, এক বছর পর দেখা গেল বিশ্বে একটাই মাত্র পরাশক্তি, আর তার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমেরিকা তার তুলনায় হাজার মাইল পিছনে পড়ে গেছে, কেমন হয়?' বলল প্রফেসর।

আবারও তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসল স্টোলিপিন। 'কাম অন, স্পাসিবো (বন্ধু)! তুমি ভাল করেই জানো তা কখনোই সম্ভব নয়।' ভোদকার গ্লাস তুলে নিল।

'আমি যদি বলি খুবই সম্ভব? যদি বলি তোমরা চাইলে মাত্র ছয় মাসে কাজটা সেরে ফেলা যায়?'

বিষম খেল মন্ত্রী। 'কিভাবে?'

রহস্যময় হাসি হাসল প্রফেসর। 'এবং ধরে নিতে পারি সে জন্যে শত শত বিলিয়ন, এমনকি ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতেও পিছপা হবে না মস্কো?'

'অবশ্যই না! কক্ষনো না! কিন্তু সে সুযোগ...মানে...'

'আমি সে সুযোগ তোমাদেরকে করে দিতে পারি, বন্ধু,' দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল প্রফেসর। 'বিনিময়ে মাত্র চল্লিশ বিলিয়ন ডলার চাই আমার।'

গ্লাস রেখে ঝাড়া দু'মিনিট তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল স্টোলিপিন। 'যা বলছ বুঝে বলছ তো?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল। 'তোমাকে আমি যতদূর চিনি, তাতে অন্তত এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তুমি ফালতু কথার মানুষ নও।'

'ওয়েল, দেন ইউ নো, আমি ফালতু কথা বলিনি। যা বলেছি কাজের কথাই বলেছি।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা।

'তোমার প্রস্তাবটা ঠিক কি?' প্রশ্ন করল মন্ত্রী।

হাসল প্রফেসর। 'আগে কথাবার্তা পাকা হোক, তারপর সব জানতে পারবে।'

'একটু আভাস তো অন্তত দেবে! তুমি জানো এতবড় একটা সিদ্ধান্ত আমি একা নিতে পারি না। পলিট ব্যুরোর অন্যান্য সদস্য আছে, পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল, মানে খোদ প্রেসিডেন্ট আছে, তাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে। তারপর না...'

'আমিও তো তাই চাইছি,' বলল সে। 'এখন তোমাদের প্রেসিডেন্টও দাচায় আছেন। পলিট ব্যুরোর বাকি সদস্যরাও আছে। প্রয়োজনে একটা প্রাইভেট মীটিঙের ব্যবস্থা করতে পার তুমি। সবাইকে জানাতে পার আমার প্রস্তাবের কথা।'

'সে না হয় হলো। কিন্তু প্রস্তাবটা কি, সেটাই তো এখনও...'

'সময় হলে আমি জানাব। তার আগে আমাকে কিছু ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।'

চোখ কুঁচকে উঠল মন্ত্রীর। 'যেমন?'

মুচকি হেসে তার কাঁধে হাত রাখল প্রফেসর ত্রিপাঠী। 'ভুল বুঝো না, বন্ধু। তুমি, তোমরা আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। আমি তার বিনিময়ে তোমাদের জন্যেও কিছু করতে চাই। তবে...'

'তবে কি?'

'দাবির অর্ধেক টাকা পেলে প্ল্যান জানাব আমি। বাকিটা তোমাদের কাজ হয়ে গেলে দেবে।'

'কাম অন, ডিয়ার। তুমি মুখ খোলার আগেই বিশ বি-লি-য়-ন ডলার দাবি করছ। ব্যাপারটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে না?'

তার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল ত্রিপাঠী। 'না। কারণ আমি মুখ খুললেই প্ল্যান জানার কিছু বাকি থাকবে না আর। তখন হয়তো টাকাটা পাব না আমি।'

'অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে আর বিশ্বাস করো না,' একটু গম্ভীর হলো বরিস স্টোলিপিন।

'বরিস, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এটা কনট্রাক্ট, লেন-দেনের ব্যাপার। তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ ঠিকই, কিন্তু সে জন্যে আগেই গুনে গুনে টাকা দিতে হয়েছে আমাকে। হয়েছে না? তাহলে আমাকে টাকা দিতে তোমাদের দ্বিধা থাকবে কেন?'

গুম্ মেরে বসে থাকল সমর মন্ত্রী।

'অবশ্য শুধু টাকা দিলেই চলবে না,' প্রফেসর বলল। 'একই সাথে আমার সাথে লিখিত এক চুক্তিও সই করতে হবে তোমাদেরকে। প্রেসিডেন্ট এবং পলিট ব্যুরোর যতজন সদস্য তোমরা রয়েছ, সবাইকে ওটায় সই করতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল মন্ত্রীর। 'কিসের চুক্তি?'

হাসি ফুটল প্রফেসরের মুখে। 'বাকি টাকা পরিশোধের, এবং আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাসের চুক্তি।' গলা ঝপ্ করে একদম খাদে নামিয়ে ফেলল সে। 'একই সাথে তোমার আর

আমার মধ্যেও একটা চুক্তি হবে। সেটা হবে খুব গোপনে, তুমি-আমি ছাড়া কেউ জানবে না তার খবর।'

'তোমার কথাবার্তা ধোঁয়াটে লাগছে। খুলে বলো। দ্বিতীয় গোপন চুক্তিটা কিসের?'

চারদিকে তাকাল ত্রিপাঠী। 'এ ঘরে হয়তো কোন লুকানো মাইক্রোফোন-টোন থাকতে পারে।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল মন্ত্রীর। 'আমার দাচায়!' বলেই হা- হা করে হেসে উঠল। 'কি আবোল-তাবোল বকছ তুমি?'

পাত্তা দিল না ত্রিপাঠী, উঠে গিয়ে টিভি অন করল। ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়। 'রিটায়ার করতে আর ক'বছর বাকি তোমার, বরিস?' প্রশ্ন করল সে।

'বছর পাঁচেক। কেন?'

'অবসর জীবন কোথায় কাটাতে চাও?'

শ্রাগ করল মন্ত্রী। 'এ নিয়ে কখনও চিন্তা করিনি। আর···আমি একা মানুষ, যে কোন এক জায়গায় কাটিয়ে দেব আর কি! কেন জানতে চাইছ এসব?'

জবাব দিল না ত্রিপাঠী। 'ধরো, যদি সুইটজারল্যান্ড কি বেলজিয়াম বা আর কোথাও তোমার অবসর জীবন কাটানোর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তুমি আপত্তি করবে?'

জবাব না দিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ছোটখাট মানুষটা। চেহারায় চিন্তার ছাপ।

'বড় বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, ব্যাঙ্কে নিজের নামে কয়েক মিলিয়ন ডলার, ইচ্ছেমত খরচ করার স্বাধীনতা, জীবন যতভাবে সম্ভব উপভোগ করার সুযোগ, এসব পেতে ইচ্ছে করে না তোমার?'

জবাব নেই।

'আমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে এসব খুব সহজেই তুমি অর্জন করে নিতে পারো, বরিস।'

'কি ধরনের সাহায্য?' মন্ত্রী অন্যমনস্ক।

সেদিন আরও দু'ঘণ্টা মন্ত্রী স্টোলিপিনের দাচায় ছিল প্রফেসর ত্রিপাঠী। সমস্ত খুঁটিনাটি তাকে জানিয়ে, প্ল্যান-প্রোগ্রাম পাকা করে তবে ফিরেছে। তাকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছিল সমর মন্ত্রী, করেছেও। সে যতটা চেয়েছিল, তার চেয়ে বরং বেশিই করেছে।

তার তত্ত্বাবধানেই রুশ প্রেসিডেন্ট ও পলিট ব্যুরোর সদস্যদের স্বাক্ষর করা চুক্তিপত্র আর প্রথম দশ বিলিয়ন ডলারের চেক তার নাসাউ অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ওখান থেকে সে সব সরিয়েও ফেলা হয়েছে অন্যখানে। আর দশ বিলিয়ন বাকি। কয়েকদিনের মধ্যে রুশরা লংইয়ারবিয়েনে তাদের আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসাতে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজটা হয়ে গেলেই দ্বিতীয় চেক পাচ্ছে সে।

ততক্ষণ পর্যন্ত মস্কোর স্বার্থ দেখার দায়িত্ব তার নিজের। কর্নেল ম্যাকারভ ততক্ষণ তার সাব অর্ডিনেট হিসেবে কাজ করবে।

হঠাৎ করে বাস্তবে ফিরে এল প্রফেসর। ঘড়ির ওপর চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল। 'নরডিল,' সেক্রেটারির নাম উচ্চারণ করল সে। 'ম্যাকারভকে আসতে বলো।'

পাঁচ মিনিট পর নক্ করে ভেতরে ঢুকল ম্যাকারভ। তাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। দরাজ গলায় বলল, 'গুড ইভনিং, পলকভনিক!'

'গুড ইভনিং, স্যার।'

'বসুন, কথা আছে। ড্রিঙ্কস? হেলপ্ ইওরসেলফ,' হাত ইশারায় বাঁ দিকের দেয়ালঘেঁষে রাখা খুদে লিকার কেবিনেটটা দেখাল।

চার

রানা এজেন্সি। লন্ডন। সোয়ালবার ঘটনার চারদিন পরের কথা।

'বলেছি না আর কথা নয়?' তেড়ে উঠল সোহানা। 'অনেক হয়েছে, এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। সকাল হতে দেরি নেই।'

'চেষ্টা তো করছি, ঘুম না এলে আমি কি করব?' নিরীহ গলায় বলল মাসুদ রানা।

'মোটেই চেষ্টা করছ না তুমি। কেবল বক্ বক্ করছ।'

শব্দ করে হেসে উঠল ও। 'এই দেখো, একেই বলে "যার জন্যে করি চুরি সে-ই বলে চোর"।'

'মানে?' সোহানা বলল। রানার বেডরুমের কিং সাইজ খাটের হেড রেস্টে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে ও, ধপ্‌ধপে সাদা শীটে বুক পর্যন্ত ঢাকা। জানালা দিয়ে আসা অস্তমিত চাঁদের মৃদু আলোয় ওকে অপূর্ব লাগছে রানার। ধপ্‌ধপে সাদা চাদরে ছড়িয়ে আছে ওর একরাশ কালো চুল, তার মধ্যে ফরসা মুখটা যেন ঝলমল করছে।

'আমার সঙ্গে কিছুদিন কাটাবে বলে এতদূর থেকে কাজ ফেলে ছুটে এসেছ...'

'কারেকশন,' বাধা দিল সোহানা। 'কাজ ফেলে আসিনি, শেষ করে তবে এসেছি।'

'ওই আর কি! সে কথা মনে রেখেই তো আমি চেষ্টা করছি তোমাকে সঙ্গ দিতে, আর তুমি সে জন্যে আমাকেই দায়ী করছ!'

'হয়েছে। এক দিনেই সব সঙ্গ দিয়ে ফেললে কাল কি দেবে? নাও, শুয়ে পড়ো। আমি চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

ফ্লোরিডায় এক কাজে এসেছিল সোহানা। রানা লন্ডনে ছুটিতে আছে জানতে পেরে তাড়াতাড়ি সেটা সেরে কয়েকদিন ওর সাথে কাটাবে বলে গতকাল এসেছে এখানে। সাতদিনের ছুটির দরখাস্ত ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে অবশ্য, কিন্তু রাহাত খান ছুটি দেবেন কি না ভেবে চিন্তায় আছে।

সারাদিন কেবল গল্পই করেছে ওরা। বহুদিন পর একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে মনের জমে থাকা সমস্ত কথা খালাস করেছে। কিন্তু মন ভরেনি, দিন গেছে, রাতও যায় যায়, তবু কথা ফুরোতেই চায় না। এত কথা, এত গল্প কোথায় জমা ছিল, ভেবে অবাক দু'জনেই।

এয়ারকূলারের একঘেয়ে গুঞ্জন শুনতে শুনতে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, চুলে প্রিয় নারীর ছোঁয়ায় তা আরও গাঢ় হলো, স্নিগ্ধ একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কতক্ষণ পর জানে না, টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল, চোখ মেলল চট করে। তাকিয়ে দেখল তখনও ঠিকমত আলো ফোটেনি। তবে ফরসা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

ওর বুকের কাছে সোহানাকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকতে দেখল রানা। ঘুমে বিভোর। একরাশ কালো চুলের মধ্যে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা অপূর্ব লাগছে।

আবার ফোন বাজতে হুঁশ হলো ওর। সোহানার ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওপাশের বেড সাইড টেবিল থেকে টেলিফোনের হ্যান্ডসেটটা তুলে নিল ও, বিচ্ছিরি শব্দে হাই তুলে কানে লাগাল। 'ইয়েস!'

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে!'

রাহাত খানের গলা শুনে একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল ও। বেখেয়ালে উদোম হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি শীট দিয়ে নিজেকে ঢাকল। আর যাই হোক, অন্তত এই লোককে ভুলেও বেডরূমে আশা করেনি। 'স্যার!'

ওর সম্বোধন শুনে চট্ করে চোখ মেলল সোহানা, মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেছে ঘুম। মুখ সামান্য হাঁ।

'আপনি কোথায়, স্যার?'

'পথে,' বললেন রাহাত খান। 'নরফোক যাচ্ছি।'

তার মানে বুড়ো প্লেনে? ভাবল ও, স্যাটেলাইট ফোনে... 'বলুন, স্যার।'

'ওখানকার ন্যাটো হেডকোয়ার্টার্সে থাকব আমি। তোমাকে দরকার ওখানে, চলে এসো!'

করুণ চোখে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'আজই?'

'এখনই!' কড়া মিলিটারি মেজাজ ফুটল বৃদ্ধের গলায়। 'তোমার ছুটি ক্যানসেল হয়ে গেছে।'

'জ্বি, স্যার,' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও।

'সোহানাকেও নিয়ে এসো। ওর ছুটিও গ্র্যান্ট হয়নি। ফার্স্ট অ্যাভেইলেব্‌ল্ ফ্লাইটে চলে এসো দু'জনে। রাখছি।'

লাইন কেটে গেছে শুনে হ্যান্ডসেট নামাল ও, শূন্য দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'ছুটির হাতে হ্যারিকেন।'

'কার?'

'আমার, তোমার।' এক মুহূর্ত পর ব্যাপারটা খেয়াল হতে আধ হাত জিভ কাটল রানা। 'অ্যাই, তুমি এখানে, সে কথা বুড়ো জানল কি করে?'

'অ্যাঁ!' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল সোহানার। 'কী বলছ?'

'উনি জানেন তুমি এখানে আছ।'

'ছি, ছি!' গালে লাল রং ফুটল সোহানার। 'কি লজ্জা! কি ভাবলেন উনি?'

'এখন আর লজ্জায় লাল হয়ে লাভ কি?' বলল রানা। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন ওঠো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

'কেন? এখনই কিসের জন্যে...'

'আমরা নরফোক যাচ্ছি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'বুড়ো যেতে বলেছে। হলো?' ওর দিকে হাত বাড়াল।

'অ্যাই, অসভ্য! কি হচ্ছে!' থাবা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল সোহানা। 'বস্ ডেকেছেন? কেন?'

'কি জানি!' শ্রাগ করল ও। 'উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। মনে হয় দেখতে চাইছে তুমি পোয়াতি হয়েছ কি না।'

বেড সাইড টেবিল থেকে ওকে এক ঝট্‌কায় টেবিল ঘড়িটা তুলে নিতে দেখে একলাফে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা, দু'হাতে মাথা আড়াল করে রেখেছে। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল সোহানা।

নর্থ আটলান্টিক ট্রীটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটোর জন্মস্থান প্যারিস। সিন নদীর তীরে বিখ্যাত প্যালাইস দো শ্যালিয়ট্ ভবনে ছিল প্রথম অফিস। কিন্তু ১৯৬৬ সালে সংস্থার কাজকর্মে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ প্রেসিডেন্ট দ্য গল তাঁর দেশ থেকে অবিলম্বে ন্যাটোর অফিস সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। সে সময় বেলজিয়াম এগিয়ে আসে, নিজের দেশে অফিস খোলার প্রস্তাব দেয় ন্যাটোকে। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় শিল্প শহর মনস-এর অর্থনৈতিক অবস্থা খুব করুণ ছিল তখন, অধিবাসীদের বেশিরভাগই বেকার। কাজ নেই।

সেখানেই গড়ে উঠল সুপ্রিম কমান্ডার অ্যালাইড ফোর্সেস ইওরোপ-এর হেড অফিস। ন্যাটো সদর দফতর গড়ে উঠল ব্রাসেলস্ এয়ারপোর্টের কাছে এভেরি নামে এক জায়গায়। এখনও সেখানেই আছে ওটা। দু'হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক ও মিলিটারি স্টাফ দিনরাত কাজ করে এখানে, তাদের সাথে রয়েছে সংস্থার পনেরোটি সদস্য দেশের পনেরোশো কূটনৈতিক প্রতিনিধি। ন্যাটোর অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি ও ফরাসী।

সকালের রাশ আওয়ার ট্রাফিকের সাথে তাল রেখে অফিসের উদ্দেশে ছুটছে সান্ড্রা কারমেন। কিন্তু অফিসের কথা ভাবছে না সে, ভাবছে এরিক ব্রাউনের কথা। দু'জন একসাথে রাত কাটালে যা হয়, আজও তাই হয়েছে–ঘুম কম, প্রেম বেশি। এরিকের এই এনার্জিকে রীতিমত শ্রদ্ধা করে সান্ড্রা। মাস দেড়েক হলো তাদের পরিচয় ঘটেছে, এরইমধ্যে ওর অতীতের সঙ্গীহীনতার ঘাটতি প্রায় পুষিয়ে দিয়েছে মানুষটা। এত সুখ সহ্য হচ্ছে না সান্ড্রার, মনে হচ্ছে, ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

মেইন গেটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গার্ডকে পাস দেখাল সান্ড্রা, আনমনে ভাবছে, ও আমাকে গেঁথে ফেলেছে। এখন ও অসন্তুষ্ট হলে তারই ক্ষতি। এরিক সরে গেলে কি নিয়ে বাঁচবে সে?

গার্ড গেট খুলে স্যালিউট করল, ধীরগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে সংস্থার সদস্য দেশগুলোর ফ্ল্যাগ পোস্ট। শিশির ভেজা সকালে নিথর হয়ে ঝুলছে ফ্ল্যাগ। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল সান্ড্রা, ন্যাটোর চার মাথাওয়ালা নক্ষত্রের ব্রোঞ্জ মনুমেন্ট ঘুরে মূল ভবনের কার পার্কে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এল। ভেতরে ঢুকেই বুঝল অবস্থা গরম। সবাই ব্যস্ত।

জোরে পা চালাল সে। হলুদ কার্পেট মোড়া দীর্ঘ করিডর পাস পেরদাস ধরে অফিসের দিকে এগোল। পাস পেরদাসের অর্থ ওয়াস্টেড ওয়াকিং। প্রশস্ত করিডরের শেষ মাথায় আরেকটা সিকিউরিটি ডেস্ক, নীল ইউনিফর্ম পরা দুই সিভিলিয়ান গার্ড আছে ওটায়। ডেস্কে ইংরেজি ও ফরাসীতে নোটিস আছে, তাতে লেখা: যে সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছুটিতে যাবে, তাদেরকে এখানে গেট-পাস জমা রেখে যেতে হবে।

নোটিসটা দেখলেই উরসুলার কথা মনে পড়ে সান্ড্রার। ওর সহকর্মী ছিল মেয়েটা। '৮২ সালে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ন্যাটো ডকুমেন্ট চুরি করে পালিয়ে গেছে পূব জার্মানিতে। ও মরে গেছে না বেঁচে আছে, জানে না সান্ড্রা, কিন্তু আজও মেয়েটাকে ভালবাসে ও। শত্রুপক্ষের স্পাই জানার পরেও।

'ওয়েলকাম টু প্যানিক স্টেশন্স্, মিস্,' নিজের বড়সড় রুমে পা রাখতে হাসিমুখে স্বাগত জানাল এক ব্রিটিশ সার্জেন্ট, ওয়েব। 'দশটায় কাউন্সিলের ইমার্জেন্সি মীটিং বসবে প্রেজেন্টেশন রুমে। জেনারেল ব্রিফ করবেন।'

'সোয়ালবারের ব্যাপারে?' প্রশ্ন করল সান্ড্রা। সে একা বসে না এই রুমে, সার্জেন্ট ওয়েব আর লুসিও বসে। তার ও লুসির পদ এক, জেনারেলের সেক্রেটারি। ওয়েব ক্লার্ক। লোকটা বেশ হাসিখুশি, রসিক।

'এই মুহূর্তে সোয়ালবার ছাড়া আর কোন ইস্যু আছে পৃথিবীতে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'তা বটে,' সান্ড্রা হাসল। কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখল। 'জুলিয়া আসেনি?'

'এখনও না।' একটা পাতলা ফাইল এগিয়ে দিল ওয়েব। 'এটা ওয়ার্ড প্রসেসরে দিতে হবে। গরম জিনিস, চীফ অভ স্টাফের অফিস থেকে এসেছে।'

ওটার ওপর বড় করে NATO SECRET লেখা দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল সান্ড্রা। 'কত কপি চাই?'

'পঞ্চাশটা।'

কাজের ফাঁকে 'জিনিসটার' ওপর শুধু চোখ নয়, মনও বোলাল সান্ড্রা। ঠিকই বলেছে এরিক, ব্যাপারটা সম্ভবত পুব-পশ্চিমের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণ হয়ে উঠতে যাচ্ছে। তথ্যগুলো ভাল করে মনে গেঁথে নিল সে। এরিককে কতখানি জানানো যায়, ঠিক করে ফেলল।

নরফোক, ভার্জিনিয়া। ওইদিন দুপুরের কথা।

ইউএস নেভির অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত এক ভবনের মাথায় মৃদু বাতাসে দুলছে দুটো ফ্ল্যাগ। একটা যুক্তরাষ্ট্রের, অন্যটা ন্যাটোর। সুপ্রিম কমান্ডার অ্যালাইড কমান্ড আটলান্টিক বা SACLANT-এর অফিস। SACLANT হচ্ছেন এ

দেশের আটলান্টিক কমান্ডের সি-ইন-সি অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিং। ব্রাসেলসের সংস্থার মহাসচিব ও মিলিটারি কমিটি প্রধান জেনারেল অ্যান্ডারসনের অধীনে ন্যাটোর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অন্যটা যথারীতি দেশের প্রেসিডেন্টের অধীনে।

মাঝারি উচ্চতার মানুষ তিনি, গাট্টাগোট্টা। বয়স বাষট্টি, কিন্তু দেখলে পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না। মুখটা প্রায় গোল। ধূসর চুল। তাঁর রুমটা বিশাল। দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের ছবি। আর আছে প্রকাণ্ড এক ওয়াল ম্যাপ। উত্তর গোলার্ধের যে বিস্তীর্ণ এলাকা ন্যাটোর আওতায় রয়েছে, তার পুরোটা আছে ওতে। একদিকে নর্থ পোলের দক্ষিণ থেকে শুরু করে ট্রপিক অভ ক্যান্সার পর্যন্ত, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পুব থেকে নিয়ে ইওরোপের গোটা উপকূল রেখা ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত।

নিজের বিরাট ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন হাওয়ার্ড কিং। মুখ শুকনো। চিন্তিত, অন্যমনস্ক। তাঁর মুখোমুখি বসা তাঁর ডেপুটি, ব্রিটিশ ভাইস-অ্যাডমিরাল (অব.) ফ্রাঙ্ক শিপলেক এবং মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। শিপলেক প্রকাণ্ডদেহী মানুষ, প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা। মুখটাও প্রকাণ্ড। যখন হাসেন, ঘরদোর কাঁপে। একটা ব্যাপারে এই তিনজনের মিল আছে, প্রত্যেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তখন থেকেই পরস্পরের বন্ধু ওঁরা।

এ মুহূর্তে সোয়ালবার প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন তিন বৃদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের তুলনায় অনেক সফল স্ট্রাটেজিস্ট ছিলেন রাহাত খান, তাই সোয়ালবার সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায়, তার কৌশল ঠিক করতে তাঁকে ডাকা হয়েছে। অবশ্য আবছা ইঙ্গিতে তিনিই সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। কি ঘটতে চলেছে কিভাবে যেন আন্দাজ করতে পেরেছেন তিনি, তাই আসার পথে মাসুদ রানাকে খবর দিয়ে এসেছেন।

'মাসুদ রানা আসছে?' ঝুঁকে বসে বললেন কিং।

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'ওর এক বান্ধবীসহ।'

'এই বান্ধবীটি কে?'

'আমাদেরই আরেক অপারেটর।'

'আই সী!' একটু ভাবলেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু ও কাজটা করবে তো?'

'করবে,' দৃঢ়স্বরে বললেন বৃদ্ধ। 'ত্রিপাঠীর সাথে ওর কিছু ব্যক্তিগত দেনা-পাওনার ব্যাপার আছে। তাছাড়া সোয়ালবার ওর চেনা জায়গা।'

'তাই নাকি?' শিপলেক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। কয়েক বছর আগে সিআইয়ের এক আর্কটিক মিশনের লীড দিতে ওদিকে গিয়েছিল ও। কাজ সেরে ওখানে কয়েকদিন থেকেও এসেছে।'

ডেপুটির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কিং। 'যাক!'

এরমধ্যে অন্যকাজে মগ্ন হয়ে পড়েছেন মেজর জেনারেল। সোয়ালবারের অনেক ওপর থেকে মার্কিন স্যাটেলাইটের তোলা একগাদা ছবিতে দ্বিতীয়বারের মত চোখ বোলাচ্ছেন। ইনফ্রা-রেড ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে লংইয়ারবিয়েন এয়ারফিল্ড সীল করে দিয়েছে রুশরা। ব্যারিকেড স্পষ্ট দেখা যায়। কিছু ছবিতে

দেখা যায় বড় বড় কয়েকটা প্যাকিং কেস। ফ্রেইট এয়ারক্র্যাফট থেকে ওগুলো আনলোড করার ছবিও আছে।

ছবি রেখে একটা ফোল্ডার তুলে নিলেন বৃদ্ধ। ওর মধ্যে কিছু পত্রিকার সোয়ালবার ঘটনা সম্পর্কিত খবরের কাটিং–ঘটনার দু'দিন পর প্রকাশ হওয়া প্রথম খবর। প্রতিটা পত্রিকার খবর একই রকম, সূত্র এক। লংইয়ারবিয়েন এয়ার ফিল্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কর্মচারী টেলিফোনে খবরটা জানিয়েছে তাদের।

মূল বক্তব্য এরকম: গত '–' তারিখ স্থানীয় সময় দুপুর ১৪.০৫ ঘণ্টায় অ্যারোফ্লোটের একটা ফ্লাইটে (টু ও সেভেন) একদল ফুল-ইউনিফর্মড রুশ বর্ডার পুলিস এসে লংইয়ারবিয়েন এয়ার ফিল্ডে অবতরণ করে এবং ফিল্ড দখল করে নেয়। তাদের সাথে সিভিল ড্রেসের আরও একদল লোক ছিল। পরিচয় জানা না গেলেও তারা যে রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর কোন বিশেষ শাখার সদস্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হরাইজন মাইনিং কোম্পানি নামে স্থানীয় এক প্রাইভেট কোম্পানির কিছু 'খনি শ্রমিকও' পরে তাদের সাথে যোগ দেয়।

এই কোম্পানির মালিকের পরিচয় অজ্ঞাত। সবাই তাকে প্রফেসর ত্রিপাঠী বলে জানে। লোকটার পুরো পরিচয়, জাতীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়নি। তার মাইনে কেবল রুশ শ্রমিকরাই কাজ করে। কিছুদিন আগে এই লোকই এ-অঞ্চলে লংইয়ারবিয়েন গোল্ড কাপ নামে এক রাগবি টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করে।

খবরে প্রফেসর ত্রিপাঠী ও অ্যারোফ্লোটের 'স্টেশন ম্যানেজার' ম্যাকারভের নাম এসেছে কয়েকবার। বলা হয়েছে, ফ্লাইটটি অবতরণের পর রহস্যজনক কারণে এই প্রফেসর ত্রিপাঠী মস্কোর হয়ে কথা বলে স্পিটসবার্গেনের গভর্নর প্রিবেনসেন সিসেলম্যানের সাথে। গভর্নর রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে নরওয়ের সার্বভৌমত্বের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করলে তাঁকে জানানো হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এ কাজ করতে বাধ্য করেছে মস্কোকে।

পুব আটলান্টিক আর ব্যারেন্ট সাগরে মহড়ার নামে দীর্ঘ দু'মাস যাবৎ ক্রুজ মিসাইলবাহী অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। মস্কো অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছে, কানে তোলেনি। আগেও কয়েকবার এধরনের গোয়েন্দাবৃত্তি চালিয়েছে তারা। তাই এবার বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সোয়ালবারের খুব কাছেই কোলা পেনিনসুলা, রুশ নর্দার্ন ফ্লীটের হোমবেস। যুক্তরাষ্ট্রের খামখেয়ালীপনার জন্যে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত...

ঘটনার দিন সন্ধের সময় লংইয়ারবিয়েন এয়ার ফিল্ড 'ক্লোজড্' ঘোষণা করা হয়েছে। কোন বিমান নামতে দেয়া হচ্ছে না।

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওটা রেখে দিলেন রাহাত খান। 'নরওয়ে কোন কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন?'

'আর নিয়েছে,' হতাশ কণ্ঠে বললেন হাওয়ার্ড কিং। 'রাশিয়ার প্রশ্নে ওরা সব সময়ই সফট।'

'কথাটা ঠিক নয়,' বললেন রাহাত খান। 'আটাত্তর সালের "হপেন আইল্যান্ড ইন্সিডেন্সের" কথা স্মরণ করো। ইলেক্ট্রনিক সার্ভেইল্যান্স ইকুইপমেন্টস বোঝাই

একটা রুশ প্লেন ক্র্যাশ করেছিল ওখানে। সোয়ালবারের সামান্য দক্ষিণে।'

'মনে আছে,' শিপলেক বললেন। 'রাশানরা জোর করে ওটার ধ্বংসাবশেষ তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ওরা দেয়নি। শুধু তাই নয়, ব্যাটারা জোরাজুরি করতে নরওয়েজিয়ান এক করভেট ক্যাপ্টেন গুলি করার হুমকিও দিয়েছিল। উপায় নেই দেখে পিছু হটতে হয় রুশদের।'

'এবারও তাই করতে হবে,' হাওয়ার্ড কিং বললেন। 'বীচিতে ভালমত একটা গুঁতো না খেলে নড়বে না ওরা। ন্যাটোর এখন একমাত্র কাজ...'

'"ন্যাটোর" বলছ কেন?' বাধা দিলেন ডেপুটি শিপলেক। 'সমস্যাটা তো তোমাদের সৃষ্টি।'

'তাই বলে এরকম সরাসরি রুশ হুমকির মুখে ন্যাটো বসে থাকবে?' কিঙের কণ্ঠে রাগের আভাস। 'শোনো, বন্ধু, এটা ওদের সু-পরিকল্পিত একটা পদক্ষেপ। আমাদের ক্যারিয়ার ব্যারেন্ট সী-তে গেছে, তাতে হয়েছে কি? আমাদের ডিফেন্স সেক্রেটারির কথামত ব্যারেন্টের যে অংশ আন্তর্জাতিক সীমায় পড়ে, ঠিক সেই পর্যন্তই গিয়েছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেপুটি। 'ভদ্রলোক "তোমাদের" ডিফেন্স সেক্রেটারি, কিং, অন্য কোন দেশের নন।'

'তুমি বলতে চাইছ, এই কারণে ন্যাটো আমাদেরকে সহযোগিতা দেবে না? ভুলে যেয়ো না এতবছর আমরাই ইওরোপের নিরাপত্তা দিয়েছি।'

'জানি। তারপরও তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর ডিফেন্স সেক্রেটারিকে একটা তিক্ত বাস্তব মেনে নিতে হবে, বন্ধু, ওরা যে ব্যারেন্ট সী-কে নিজেদের হোমওয়াটার বলে দাবি করে, সেখানে মহড়া দিতে গিয়ে মস্কোকে বেইজ্জত করেছ তোমরা। তার প্রতিশোধ হিসেবে টেক্‌নিক্যালি ন্যাটো টেরিটরি সোয়ালবারে থাবা চালিয়েছে রাশিয়া।'

'কাজেই ন্যাটোকে এখন পাল্টা কিছু করতে হবে,' জোর দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল কিং।

'অফিশিয়ালি কিছু যদি দাবি করো তোমরা, তা বোধহয় পূরণ হবে না। আমার মতে ইওরোপিয়ানরা প্রতিবাদ জানানোর চেয়ে বেশি কিছু করবে না। সোয়ালবার তাদের জন্যে কোন হুমকি নয়।'

'কিন্তু আমার দেশের জন্যে হুমকি,' দুম্ করে ডেস্কে কিল মারলেন অ্যাডমিরাল। 'ম্যাপের দিকে তাকাও, ফ্র্যাঙ্ক। এক ধাক্কায় আমাদের দিকে আটশো মাইল এগিয়ে এসেছে ওরা। এখন যদি ওখানে আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসায়, অবস্থা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখো। কেবল আমাদের দিকেই এগিয়ে এসেছে বলে বগল বাজিয়ো না, তোমাদের দিকেও ছয়শো মাইল এগিয়েছে। ধারাল ছুরি দিয়ে ইওরোপকে নিখুঁতভাবে দু'ভাগ করে ফেলেছে।'

দুই বন্ধুর সাথে রাহাত খানও তাকালেন ম্যাপটার দিকে। একটুও বাড়িয়ে বলেননি হাওয়ার্ড কিং। সোভিয়েত ইউনিয়ন লংইয়ারবিয়েনে আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসাতে পারলে মিসাইল সুপিরিয়রিটির গোটা ডাইমেনশনই বদলে যাবে। স্রেফ ঢোঁড়া সাপে পরিণত হবে আমেরিকা। তারওপর রুশরা যদি ওখানে ইন্টারসেপ্টর

এয়ারক্র্যাফট বেস স্থাপন করে, তাহলে তো সমূহ বিপদ।

আমেরিকান বোমারু বিমান বা লো-ফ্লাইং মিসাইল আর সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না কখনও। আটলান্টিকের ওপরেই ওগুলোকে গুলি করে ফেলে দেবে ওরা। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হয়ে উঠবে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

'বুঝলাম,' মাথা নাড়লেন শিপলেক।

'কি বুঝলে?' বললেন কিং। 'এরপরও বলছ ন্যাটো আমাদের পাশে দাঁড়াবে না এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে?'

'আমি নিজের কথা বলছি না। বলছি সবাইকে এক জোট করতে প্রচুর সময় লাগবে। ততদিনে দেরি হয়ে যাবে অনেক।'

'তাহলে আমি যেভাবে বললাম সেইভাবে করো,' পরামর্শ দিলেন রাহাত খান। 'একটা ক্ল্যান্ডেস্টিন মিশন পাঠাও। ওরা যদি রাডার বসায়, ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। সব সদস্য যদি রাজি না হয় আমেরিকা, ব্রিটেন আর নরওয়ে, তোমরা এই তিন দেশ মিলে সেরে ফেলো কাজটা। তাতে সময় অন্তত বাঁচবে।'

মৃদু হাসি ফুটল অ্যাডমিরালের মুখে। রাহাত খানের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তাই করব আমরা। ওপরে ওপরে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাবার ভান করব, আর ভেতরে ভেতরে...খান ঠিকই বলেছে। ক্ল্যানডেস্টিন মিশন পাঠিয়েই ধ্বংস করে দিতে হবে ওদের রাডার। মস্কোকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। তাছাড়া ন্যাটোর টার্মস অনুযায়ী সোয়ালবার তো আটলান্টিক কমান্ডেরই আন্ডারে, ইওরোপিয়ান কমান্ডের নয়।'

'তবু ব্রাসেলস্‌কে না জানিয়ে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না তোমাদের,' বললেন বৃদ্ধ। 'ওদেরকেও জানাও তোমরা কি করতে চাইছ। তাছাড়া সোয়ালবারে কিছু করতে গেলে কমান্ডো মিশনের গ্রাউন্ড-লেভেল ইনফর্মেশন প্রয়োজন হবে। অসলোর কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাও। এই ইনফর্মেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'রাইট,' মাথা ঝাঁকালেন ভাইস-অ্যাডমিরাল।

'তুমি তাহলে কাজ শুরু করে দাও, ফ্র্যাঙ্ক,' কিং বললেন। 'ব্রাসেলস্ আর অসলোকে আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে আভাস দাও। গ্রাউন্ড-লেভেল তথ্য চেয়ে পাঠাও। মাসুদ রানার সাথে কথাবার্তা বলে আজই প্রেসিডেন্টকে সব জানাচ্ছি আমি।'

শিপলেক নিজের রুমে চলে যেতে রাহাত খানের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'কফি?' ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন, এই সময় বেজে উঠল ওটা। 'ইয়েস!' এক মুহূর্ত পর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন তিনি। 'শিওর, সেন্ড দেম ইন, প্লীজ!'

কয়েক মুহূর্ত পর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা ও সোহানা। অ্যাডমিরাল কিং আসন ছাড়লেন, কয়েক পা এগিয়ে নিজেই পরিচয় পর্ব সেরে নিলেন ওদের সাথে। 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ টু। থ্যাঙ্কস ফর কামিং।'

'ইট'স আওয়ার প্লেযার, স্যার,' জবাব দিল রানা। ঘুরে তাকাল রাহাত খানের দিকে। মাথা দুলিয়ে ওদেরকে বসতে বললেন তিনি।

রানার দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'তোমাদের আসতে বলেছি জরুরী একটা কাজে। লংইয়ারবিয়েনের ঘটনা তো শুনেইছ।'

'মোটামুটি, স্যার।'

'সেই ব্যাপারে অ্যাডমিরাল কিছু বলবেন এখন,' বললেন তিনি। 'শুনলে তুমি হয়তো ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠতে পার। হাওয়ার্ড, বলো।'

'এক মিনিট,' ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিলেন তিনি। রিসিভার রেখে আসল প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় ঘরে ঢুকলেন ফ্র্যাঙ্ক শিপলেক। 'আহ্, ফ্র্যাঙ্ক! মীট দিস্ বিউটিফুল কাপ্‌ল্।' বিউটিফুল শব্দটা সোহানার ওপর চোখ রেখে বললেন কিং, এবং বেশ জোর দিয়ে।

দুজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনিও বসলেন। অ্যাডমিরালের উদ্দেশে বললেন, 'ওদিকে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ব্রাসেলস্ কাউন্সিল মীটিং কল করেছে।'

'গুড! অসলো?'

'কাজে লেগে পড়েছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। ওসব পরে হবে, আগে...' রানার দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'নাউ, মেজর মাসুদ রানা। রাহাত খান আমাদের দু'জনেরই অনেক পুরনো বন্ধু। লংইয়ারবিয়েনের ঘটনায় রুশদের হয়ে মধ্যস্থতা করছে প্রফেসর ত্রিপাঠী নামের এক লোক, শুনেছেন তো? রাহাত বলছে, লোকটা মোটেও ভারতীয় নয়, আসলে বাংলাদেশী। তাই...পরামর্শের জন্যে আপনাদের ডেকেছে ও।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা। সোহানাও লজ্জা ভুলে তাকাল। 'বাংলাদেশী!' রানা বলল। 'কে, স্যার?'

'কবীর চৌধুরী,' গমগমে কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ।

'কবীর চৌধুরী!'

'হ্যাঁ। ঘটনা খুলে বলো, হাওয়ার্ড,' বললেন বৃদ্ধ।

'বলছি,' নড়েচড়ে বসে পুরো ঘটনা খুলে বলতে শুরু করলেন কিং। কবীর চৌধুরীর প্রসঙ্গ শেষ হতে লংইয়ারবিয়েন দখলের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি কি সুবিধে পাচ্ছে, তাও বললেন। একটাও প্রশ্ন না করে শুনে গেল রানা।

তাঁর বলা শেষ হতে রাহাত খান মুখ খুললেন। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ওখানে আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসায়; বসাবে তো অবশ্যই, তাহলে কমান্ডো মিশন পাঠিয়ে ওটাকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছে এদের। মিশনের লীডার হিসেবে তোমার নাম প্রস্তাব করেছি আমি। এদের কাজও হবে, তার সাথে আমাদের কাজও হবে।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার। কিন্তু আমরা একটা রাডার ধ্বংস করে রেখে এলে ক'দিন পর ওরা আবার একটা বসাবে। তাহলে মিশন পাঠিয়ে লাভ কি? শুধু কবীর চৌধুরীর ব্যাপার তো একজন বা দু'জন গিয়েই মিটিয়ে ফেলা যায়।'

'আসল ব্যাপার হচ্ছে,' শিপলেক বললেন এবার, 'এজন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। কিন্তু নেক্সট টাইম তা আর সম্ভব হবে না। আপনারা ওই রাডার ধ্বংস করে দেয়ার সাথে সাথে আকাশে-সাগরে টোটাল ব্লকেড ঘোষণা করবে ন্যাটো, কোন রুশ প্লেন বা জাহাজ যাতে ওই এলাকার ধারেকাছেও যেতে না পারে, সে ব্যবস্থা করবে। তাহলে একদিন ওরা নিজেরাই ওই জায়গা ছেড়ে

চলে যাবে। আফটার অল, রাডারই যদি বসাতে না পারল, তাহলে ওখানে থেকে করবেই বা কি?'

'বেশ,' রানা বলল।

'মিশন লীড দিতে আপনার কোন আপত্তি বা...' অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিং প্রশ্ন করলেন।

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ও। তিন বৃদ্ধের দৃষ্টি বিনিময় হলো দ্রুত।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মেজর,' কিং বললেন।

'আপনি তো আগে একবার গিয়েছিলেন লংইয়ারবিয়েনে!' ফ্র্যাঙ্ক শিপলেক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। বেশ কয়েক বছর আগে।'

ঠোঁট মুড়ে একটু ভাবলেন শিপলেক। 'কতদিনের মধ্যে যাত্রা করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'আগে ওখানকার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হবে আমাকে,' রানা বলল। 'দ্যাট ইজ, গ্রাউন্ড-লেভেল ইনফর্মেশন। ওটা ভাইটাল।'

'সে-কাজ অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমরা। আশা করছি দুই-তিন দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশন পেয়ে যাব।'

'তাহলে প্লাস দশদিন।'

'ওকে। সদস্য বাছাইয়ের পর এক্সারসাইজ দরকার হবে নিশ্চই?' কিং প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ও।

'কোথায় করতে চান?'

একটু ভাবল রানা। 'হাই সিয়েরায়।'

'নো প্রবলেম। আর কিছু?'

'গ্রাউন্ড-লেভেল তথ্য পেলে কমান্ডো বাছাই ইত্যাদি কাজে হাত দেব আমি। বাই দ্য ওয়ে, সোয়ালবারে কোন নরওয়েজিয়ান স্লীপার এজেন্ট বা সেল আছে কিনা জানতে হবে। থাকা উচিত। ভেতরের সাহায্য দরকার হবে আমাদের।'

ব্রাসেলস্। অফিস ছুটি হওয়ার একটু আগে জেনারেল অ্যান্ডারসনের স্টাফ অফিসার ব্রিগেডিয়ার কার্টিস এসে ঢুকল সান্ড্রা-জুলিয়ার রুমে। 'এই যে, মেয়েরা,' বলল সে। 'জরুরী ব্যাপার, আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে তোমাদেরকে।'

'কিন্তু, স্যার,' জুলিয়া হড়বড় করে উঠল। 'আজ বয় ফ্রেন্ডের সাথে থিয়েটারে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে আমার। টিকেট করা আছে। আমি না গেলে ও ঠিক মেরে ফেলবে আমাকে।'

'তাহলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমার,' হাসল ব্রিগেডিয়ার। 'বাট দিস্ ইজ টপ্ প্রায়োরিটি। নরফোকে কিছু একটা হচ্ছে।'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল জুলিয়ার। 'স্যার...'

'ঠিক আছে, আমি থাকছি,' সান্ড্রা বলল। 'আমার কোন কাজ নেই সন্ধের পর।'

'ধন্যবাদ, ডার্লিং,' চুল ঠিক করে ঝট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নিল মেয়েটা। 'আমি না গেলে এনরিকো পাগল হয়ে যাবে।'

'যাও,' সান্ড্রা হাসল। 'কিন্তু আমার প্রয়োজনের সময়...'

'আচ্ছা,' হাত নেড়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। 'সে হবে'খন। কাল দেখা হবে, চলি।'

সে বেরিয়ে যেতে ব্রিগেডিয়ারের দিকে ফিরল সান্ড্রা। 'ক্রাইসিস, স্যার?'

'হ্যাঁ। জেনারেল মেশিনগান ফায়ারের মত একনাগাড়ে অর্ডার দিচ্ছেন।'

আটটার পর অফিস ছাড়ার সুযোগ পেল সান্ড্রা। গাড়িতে ওঠার আগে অফিস বিল্ডিঙের দিকে তাকাল, কিছু কিছু রুমের আলো নেভানো দেখল ও। বেশির ভাগ জ্বলছে। ডিপ্লোম্যাটরা ব্যস্ত। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছতে না পৌঁছতে টেলিফোনের রিং শুনে হাসল মেয়েটা, বুঝতে পেরেছে কে হতে পারে।

'কেমন কাটল দিন?' প্রশ্ন করল এরিক। 'খুব ব্যস্ত গেছে মনে হচ্ছে?'

'মোটামুটি। তুমি কোথায়?'

'হোটেলে।'

'তোমার দিন কেমন কাটল?'

'খুব বাজে,' এরিক বলল। 'একদম জঘন্য! ন্যাটো কি ইশতেহার ইস্যু করেছে আজ, দেখেছ?'

'না।'

'আমি পড়ছি, শোনো। "দ্য ন্যাটো কাউন্সিল মেট ইন ক্লোজড্‌ সেশন অ্যান্ড কনসিডারড্‌ দ্য সিরিয়াস ইশ্যুজ হুইচ অ্যারাইজ..." সাচ অ্যান্ড সাচ। শেষে বলছে, "দ্য অ্যালাইজ উইল রিমেইন ইন ক্লোজ কনসালটেশন"। এ কোন কথা হলো? এ থেকে কি বুঝব আমি? এতরাত পর্যন্ত এই করল আজ তোমার অফিস?'

'কিন্তু আমার সাথে কাউন্সিলের কোন সংশ্রব নেই,' সান্ড্রা বলল।

'সে না হয় হলো,' উষ্মা প্রকাশ পেল এরিকের কণ্ঠে। 'কিন্তু এতবড় এক কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ ন্যাটো "ক্লোজ কনসাল্টেশন" ছাড়া কিছুই করবে না, এটা কেমন কথা? ম্যাগাজিনকে কি বলব, ভেবে পাচ্ছি না আমি।'

'দুঃখিত, ডার্লিং,' সান্ড্রা বলল। 'এ ছাড়া আজ আর কোন খবর নেই। বিশ্বাস করো।'

'তুমি বলতে চাইছ, আজকের মীটিঙে কাউন্সিল কোন মিলিটারি থ্রেটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না তুমি জানো না?'

সতর্ক হয়ে গেল সান্ড্রা। জানে, নিয়েছে, কিন্তু সে কথা এরিককে বলা যাবে না। 'না, না! কি বলছ তুমি? ওরকম কিছু ন্যাটো ভাবছে না। তাহলে আভাস অন্তত পেতাম আমি।'

আরও মিনিটখানেক কথা বলে ফোন রেখে দিল এরিক ব্রাউন। সামনে বসা মোটা, বিদঘুটে চেহারার লোকটাকে দেখল। এক্সটেনশন ইয়ারফোনের মাধ্যমে এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিল সে। 'ও সত্যি কথাই বলছে,' এরিক বলল। 'কাল ওর সাথে দেখা করে নতুন খবর কিছু আছে কি না জানার চেষ্টা করব।'

'আমি যোগাযোগ করব কাল,' এক্সটেনশন ওয়ায়ার পকেটে রেখে বলল

লোকটা। 'এখন নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার আমাদের। আপনার কাজের ধারা হেড অফিসের পছন্দ হয়েছে।'

'আমিও সেই আশাতেই লেগে আছি,' যুবক বলল। 'তিন বছর আগে যদি জানতাম এয়ার ফোর্সের চাকরি ছেড়ে এই করতে হবে, তাহলে কখনোই রাজি হতাম না আমি।'

'স্টাসিতে কাজ করা কতখানি সম্মানের জানেন?' রাগ রাগ গলায় বলল লোকটা। 'আপনি ভাগ্যবান। যদি আপনার এই প্রজেক্ট সফল হয়, তাহলে প্রমোশন নিশ্চিত। তারওপর একটা মেয়ের সাথে ইচ্ছেমত...' থেমে গেল সে ইচ্ছে করেই।

'আপনার ওকে মেয়ে মনে হতে পারে,' এরিক বলল।

'কেন? আপনার অন্য কিছু মনে হয়?'

'হয়। ছাগলী মনে হয়। মনে হয় ছাগলীর সাথে প্রেম করছি।'

'বেশি কথা বলেন আপনি,' বিরক্ত চেহারায় উঠে পড়ল বিদঘুটে। 'কাজ করুন। রুশ কাউন্টারপার্ট ইনফর্মেশনের জন্যে চাপ দিচ্ছে। চলি, কাল দেখা হবে।'

দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বিছানায় বসল এরিক ব্রাউন। চিন্তায় পড়ে গেছে। বুঝে ফেলেছে সান্ড্রার ওপর থেকে খুব দ্রুত আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে সে। ওর প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে। সান্ড্রা ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলে বিপদ।

কিন্তু এর কোন সমাধান দেখতে পাচ্ছে না এরিক ব্রাউন।

'সোহানাকেও দলে নিয়ে নিয়ো,' বললেন রাহাত খান।

জেট এঞ্জিনের তীব্র গর্জনে কথাটা ঠিকমত শুনতে পেল না রানা। 'জ্বি?'

'বলছি, সোহানাকে সঙ্গে নিয়ো।'

'কোথায়, স্যার?' মনের ভুরু কুঁচকে উঠল ওর।

'মিশনের সাথে,' পাইপ টানায় মন দিলেন বৃদ্ধ। নরফোক এয়ারপোর্টে প্লেনে ওঠার অপেক্ষায় আছেন। ন্যাটোর খুদে এক বিমানে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ওটাই ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে তাঁকে। রানা-সোহানা এসেছে বিদায় জানাতে। ভাইস অ্যাডমিরাল শিপলেকও এসেছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলছে সোহানা।

'সোহানাকে! স্যার, এটা খুব বিপজ্জনক মিশন হতে চলেছে। ওকে এসবের মধ্যে নেয়া কি ঠিক হবে?'

'কেন?' কট্‌মট্‌ করে তাকালেন বৃদ্ধ।

'না...মানে...'

'ওকে এসব ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করো তুমি?'

'না, স্যার,' বলল ও। 'বলছিলাম...' আমতা আমতা করতে লাগল, আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

ওর মনের অবস্থা বুঝে মনে মনে হাসলেন বৃদ্ধ। ভয় পেয়েছে রানা। সোহানা আহত হতে পারে, বা মরে যেতে পারে, এই ভয়ে আপত্তি তুলছে ও। সোহানার

ব্যাপারে ব্যাটা বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে চায় না।

'সোহানার যদি মৃত্যু আসে,' কিছুটা নরম গলায় বললেন তিনি, 'তুমি ঠেকাতে পারবে না। ঠিক যেমন তোমার মৃত্যু সোহানা বা আমি ঠেকাতে পারব না। মৃত্যু যখন হওয়ার হবে। সব ছেড়ে ঘরে বসে থাকলেও সময়মত হবেই।'

'জ্বি, স্যার।'

'তাছাড়া ও সাথে থাকলে তোমারই লাভ। মিশন কঠিন হবে সন্দেহ নেই। এ সময়ে মাতৃভাষায় কথা বলার মত একজনকে অন্তত পাবে ও সাথে থাকলে। আর এসব ক্ষেত্রে ও যে-কারও সমকক্ষ, না নিতে চাওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখি না আমি।'

'ঠিক আছে, স্যার,' পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করল রানা। 'আপনি যা বলেন।'

বন্ধু শিপলেক ও সোহানার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিলেন রাহাত খান। রানাকে বললেন, 'কোন সমস্যা হলে যোগাযোগ কোরো আমার সাথে।'

'জ্বি।'

মিনিট পনেরো পর মাটি ছাড়ল ন্যাটোর প্লেনটা, ঢাকার উদ্দেশে উড়ে চলল। ওটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত একভাবে তাকিয়ে থাকল রানা-সোহানা।

সন্ধে ঘনিয়ে আসছে তখন।

ন্যাটোর অতিথি হিসেবে ওদেরকে নরফোক শেরাটনের তিন রুমের লাক্সারি স্যুইটে তুলে দিয়ে গেলেন শিপলেক। সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। একে আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার সাথে অল্প হলেও জেট ল্যাগের ধকল কাটাতে ঘুম প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরদিন সকাল থেকে মিশনের খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ শুরু করার ইচ্ছে রানার। খুব জটিল, কঠিন কাজ। মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে সে জন্যে। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। কবীর চৌধুরীর চিন্তা মাথায় ঢুকল রানার। সান ফ্রান্সিসকো ঘটনার পর বেশ কিছুদিন খবর ছিল না লোকটার, সময়টা নিশ্চয়ই লংইয়ারবিয়েনে কাটিয়েছে সে। কিন্তু এতবড় এক আন্তর্জাতিক ঘটনায় সে কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করছে?

কবীর চৌধুরী শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভেবে হাসি পেল ওর। আর কত খেলা দেখাবে লোকটা?

'রানা!' কোমল কণ্ঠে ডাকল সোহানা।

'উঁম?'

'ঘুম আসছে না?'

'নাহ্। কবীর চৌধুরীর চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়েছে।'

'সত্যি। ও রাশিয়ার হয়ে কাজ করছে, শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগছে যেন।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' রানা বলল।

'এখন ঘুমাও। পরে ভেবো।'

'আচ্ছা,' পাশ ফিরে সোহানাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সুবোধ বালকের মত চোখ বুজল ও। পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

'অসলো থেকে ডেলিগেশন আসছে,' বলল ম্যাকারভের 'সহকারী'। ক্যাপ্টেন সে, ক্যাপটেন পাপুকিন। বড়জোর চব্বিশ হবে বয়স, হালকা-পাতলা, দীর্ঘদেহী। কিন্তু মুখটা যেন পাথর কুঁদে তৈরি। 'ডিউ ইন ফিফ্‌টি মিনিটস্‌। এসএএস ডিসি নাইন। ডিটেইলস্‌ টেলেক্সে আছে, দেখে নেবেন।'

'অসলো থেকে?' অবাক হয়ে তাকে দেখল ফ্রেডারিক ফলভিক।

'হ্যাঁ। আয়োজন কমপ্লিট,' এয়ারফিল্ডের ওপর চোখ রেখে বলল যুবক।

আসন ছেড়ে উঠল নরওয়েজিয়ান ট্রাফিক অফিসার। টাওয়ারের জানালা দিয়ে ফিল্ডে তাকিয়ে আরও অবাক হলো। এক কনটিনজেন্ট রুশ বর্ডার পুলিস ড্রিল করছে সেখানে, পীকড্‌ ক্যাপ পরা এক ওয়ারেন্ট অফিসার পরিচালনা করছে ড্রিল। বোঝা যাচ্ছে গলার রগ ফুলিয়ে অর্ডার করছে লোকটা, কিন্তু ফলভিক শুনতে পাচ্ছে না কিছুই। দলটা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সিনিয়র অফিসার প্রেজেন্ট–কর্নেল ম্যাকারভ। গায়ে কালো রঙের ভারী ওভারকোট, মাথায় অস্ত্রাখান টুপি।

'কি হচ্ছে ওখানে?' জানতে চাইল সে।

'গার্ড অভ অনারের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। কমরেড কর্নেল স্বাগত জানাবেন প্রতিনিধি দলটাকে।'

'ম্যাকারভ! প্রফেসর ত্রিপাঠী নয়?'

কঠিন হাসি ফুটল পাপুকিনের মুখে। 'কমরেড ত্রিপাঠী কোন সামরিক অফিসার নন। তাঁর কাজ পরে, আগেরটা কমরেড কর্নেলের। এটা তাঁর ডিউটি।'

আধ ঘণ্টা পর ডিসি-নাইনের পাইলট অ্যাপ্রোচ রিপোর্ট করতে গট্‌গট্‌ করে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে গেল যুবক, তার ভারী বুটের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। একটু পর এয়ারফিল্ডে দেখা গেল তাকে। এক হাতে পীকড্‌ ক্যাপ সামলে দৌড়ে যাচ্ছে ম্যাকারভের দিকে। রিপোর্ট করতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই, ফলভিক ভাবল। তার ধারণাই ঠিক, সহকারীর বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল সার্জেন্ট মেজরকে।

খবরটা গভর্নরকে জানানো দরকার ভেবে গভর্নর হাউসে ফোন করল ফলভিক, একটা অপরিচিত গলা সাড়া দিল। বলল, গভর্নর খবরটা জানেন, এয়ারফিল্ডের পথে রয়েছেন তিনি। রিসিভার রেখে জানালায় এসে দাঁড়াল সে, টারম্যাকে দুটো গাড়ি এসে ঢুকতে দেখল। একটা গভর্নর প্রিবেনসেন সিসেলম্যানের, অন্যটা প্রফেসর ত্রিপাঠীর। মুহূর্তে চোখের আড়ালে চলে গেল ও দুটো, টার্মিনাল ভবনের দিকে যাচ্ছে। ঘুরে অন্য এক জানালায় এসে দাঁড়াল ফলভিক, এখান থেকে গোটা ব্যাপারটা দেখা যাবে।

সময়মত ল্যান্ড করল ডিসি-৯, গড়িয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল টার্মিনাল ভবনের

সামনে। সঙ্গে সঙ্গে চার রুশ বর্ডার পুলিস লাল কার্পেট নিয়ে ছুটল। প্লেন কোথায় দাঁড়াবে, কার্পেটের রোলের এক মাথা কোথায় থাকলে অন্য মাথা গ্যাংওয়ের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছবে, সব ঠিক করাই ছিল, কাজেই কোন সমস্যা হলো না। জায়গামত ঝুপ্ করে ফেলে দেয়া হলো রোল, এক পুলিস ওটার প্রান্তে উঠে দাঁড়িয়ে থাকল, অন্য তিনজন রোলটাকে গড়িয়ে নিয়ে চলল প্লেনের দিকে। কাজ শেষ হতে চারজনই গ্যাংওয়ের গোড়ায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। তাদের মুখোমুখি রয়েছে ত্রিপাঠী, ওরফে কবীর চৌধুরী ও ম্যাকারভ। একটু পর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ার সিস্টেম বোয়িঙের দরজা খুলে গেল, কার্পেটের পাশে তার আগেই দাঁড়িয়ে গেছে রুশ পুলিস কনটিনজেন্ট।

প্লেন থেকে প্রথমে বের হলেন নরওয়ের পরিবেশ মন্ত্রী–মহিলা। এক হাতে ফারকোট সামলে নেমে এলেন তিনি ধীর পায়ে। পঞ্চাশ মিটার দূর থেকেও তাঁর চেহারায় বিস্ময় দেখল ফলভিক। এরপর নামলেন বিচার মন্ত্রী। পরিবেশ মন্ত্রীর পা কার্পেট স্পর্শ করামাত্র হুঙ্কার ছাড়ল সার্জেন্ট মেজর, প্রাণ এল যেন পুলিস সদস্যদের দেহে। সার্জেন্টের মুখ নাড়া দেখে ফলভিক বুঝল লোকটা বলছে, 'প্রে-জে-এ-এ-ন্ট আর্মস!'

বিস্ময় আর গাম্ভীর্যের সাথে প্যারেড পরিদর্শন করলেন দুই মন্ত্রী, তাঁদের এইডরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। পাঁচ মিনিট পর শেষ হলো অনুষ্ঠান, গাড়িতে করে গভর্নর হাউসের দিকে চলে গেল সবাই।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, ক্যাপ্টেনের গলা শুনে ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার। 'সব ধরনের ট্রাফিকের জন্যে এয়ারফিল্ড এখন থেকে আবার ক্লোজড ঘোষণা করেছেন কমরেড কর্নেল,' বলল সে। 'কেবল ব্যারেন্টসবার্গ থেকে আসা কপ্টারের বেলায় প্রযোজ্য হবে না এ ঘোষণা।'

'সেরকম হলে ম্যাকারভের আমার সাথে কথা বলে নেয়া উচিত ছিল,' জবাব দিল সে।

কঠিন চেহারায় তাকে দেখল পাপুকিন। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'উনি এখন ব্যস্ত!' মাথা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'যা বলেছি তাই করুন।'

'এক্সেলেন্ট প্যারেড হয়েছে, ভিক্টর মিখাইলোভিচ,' নিখাদ প্রশংসার সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'ঠিক এরকমই চেয়েছিলাম আমি। কংগ্রাচুলেশনস্।'

বিনয়ে গলে যাওয়ার দশা হলো ম্যাকারভের। 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

মস্কো থেকে তার জন্যে পাঠানো একেবারে নতুন, ঝকঝকে যিল লিমাজিনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কবীর চৌধুরী। গভর্নর হাউসের দিকে যাচ্ছে। সামনে দুটো সরকারী ভলভো গাড়ি, একটায় রয়েছেন গভর্নর, অন্যটায় দুই নরওয়েজিয়ান মন্ত্রী। আগে আগে যাচ্ছে ও দুটো। এয়ার ফিল্ড থেকে চার কিলোমিটার দূরে গভর্নর হাউস। উপকূল ঘেঁষে চলে গেছে রাস্তা। রাস্তার একদিকে কোল স্টোরেজ বিল্ডিং, অফিস, জেটি ইত্যাদি।

কিন্তু কবীর চৌধুরীর মন নেই কোনদিকে, আসন্ন মীটিঙের চিন্তায় মগ্ন। 'মন্ত্রীরা যদি রাতে থেকে যান, তাহলে ডিনার পার্টির আয়োজন করতে হবে,' বলল

সে। 'যতক্ষণ নিজেদেরকে ওরা শত্রু ঘোষণা না করছে, ততক্ষণ ওরা আপনাদের বন্ধু, রিমেমবার।'

'ইয়েস, স্যার,' সামনের প্যাসেঞ্জারস' সীটে বসা ম্যাকারভ মাথা দোলাল। 'আমিও ডিনারের কথাই ভাবছিলাম।'

সন্তুষ্ট হলো কবীর চৌধুরী। পাত্র নির্বাচনে সত্যিই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে সে, কোন ভুল করেনি। কর্নেল এঞ্জিনিয়ারিঙের ক্ষেত্রে যেমন ভাল, তেমনি রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট চতুর। অবশ্য হওয়ারই কথা। পাঁচ মাস আগে মস্কোয় যখন উপযুক্ত একজন সহকারী খুঁজছে সে, তখন কেজিবির বাছাই করা দেড়শো আর্মি পার্সোনেলের ফাইল মন্ত্রী বরিস স্টোলিপিন তুলে দিয়েছিল তার হাতে। 'বেছে নাও যাকে খুশি,' বলেছিল সে।

প্রতিটা ফাইল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে কবীর চৌধুরী, তারপর একে বেছে নিয়েছে। অতুলনীয় রেকর্ডের অধিকারী এই লোক। ক্যারিয়ার অফিসার হিসেবে চাকরিতে ঢুকে অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য পদ অর্জন করে নিয়েছে সে। এই সদস্যদের ওপর নির্ভর করেই চলে পলিট ব্যুরো।

কিছুটা সন্দেহ অবশ্য প্রথম প্রথম ছিল কবীর চৌধুরীর, কারণ সে জানে, রেকর্ডে অনেক সময় অতিরঞ্জিত তথ্য থাকে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই লোক হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছে, সে যা চাইছিল, কর্নেল ঠিক তাই। কবীর চৌধুরীর হিসেব আগেই হয়ে গিয়েছিল–সোয়ালবারে রুশ অবতরণের পর অসলোর সাথে রাজনীতির এক্কা-দোক্কা খেলবে সে, সেই সুযোগে আরেকজনকে দুর্গম প্লাটা বেরগেট পাহাড়ের সমতল চূড়ায় মস্কোর আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যে কোন পেশাদার সৈনিকের ক্ষেত্রে 'সুযোগ' হচ্ছে ভবিষ্যৎ। প্রতিযোগিতামূলক কাজ করে জীবনে বহুদূর যেতে পারে সে, তবে তার সাথে যদি 'সুযোগ' যোগ হয়, তাহলে হয় পোয়াবারো। সারাজীবনের জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন হয় না, আচমকা এক লাফে অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলতে পারে সে।

ছাত্র জীবনে সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখার সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (DOSAF)-এর সদস্য ছিল বরিস মিখাইলোভিচ ম্যাকারভ বা ভিকি। শূটিং, সাঁতার, বক্সিং, কুস্তি, সাইক্লিং, ড্রাইভিং, সবকিছুতে এক নম্বর ছিল। স্কুল জীবন শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় সে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে।

তার বাবা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বীর অফিসার, আর্মি মেজর। সেই সূত্রে ভার্সিটি থেকে এক নম্বর হয়ে বেরবার সাথে সাথে অফিসার্স স্কুলে ডাক পড়ে ম্যাকারভের। সেখানে দশ বছর কেটেছে তার। এরপর নিজের যোগ্যতাবলে বর্ডার ট্রুপসে বদলির আবেদন জানায় সে। সঙ্গে সঙ্গে তা অনুমোদন হয়। এই বাহিনীর অফিসারদের রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত হওয়া খুবই জরুরী, এবং সেটা তার মধ্যে ছিল ষোলো আনাই।

কিছুদিন পর মেজর পদে উন্নীত হয় ম্যাকারভ, অ্যাঙ্গোলার মার্কসবাদী

সরকারের সেনাবাহিনীর অ্যাডভাইজার হিসেবে বদলি হয়ে যায়। সেখানেই পেশাদার সৈনিক জীবনের প্রথম সুযোগটি আসে। সে-দেশে ত্রিমুখী যুদ্ধ চলছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে। একদিকে সরকারী বাহিনী, অন্যদিকে ছিল অ্যাঙ্গোলার বিদ্রোহী নেতা জোনাস সাভিম্বির গেরিলা বাহিনী ও তাদেরকে সহায়তাকারী রুশ বাহিনী। শেষের দলটির হয়ে কাজ অবশ্য তাদের বলির পাঁঠা কিউবান আর্মিই করত।

কোন আফ্রিকান ভিয়েতনামে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে পলিট ব্যুরোর ছিল না। তাই সে যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়নি রেড আর্মি। মস্কোর কয়েকশো মিলিটারি অ্যাডভাইজার ছিল কেবল। ম্যাকারভের দায়িত্ব ছিল পরের তিন বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। অসম্ভব এক কাজ ছিল সেটা।

একে অসহ্য গরমে মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটত, তার ওপর রাস্তা বলে তেমন কোন পদার্থ ছিল না ওদেশে। ছিল কেবল কাঁটাঝোপ আর ধুলোমোড়া ধু-ধু প্রান্তর। কিছু নদীও ছিল–এই শুকনো, খট্‌খটে, এক ঘণ্টা পরই আবার ভয়াবহ, তীব্র স্রোতস্বিনীর রূপ নিত সেগুলো। এই নদীগুলোর ওপর ব্রিজ তৈরি করা ছিল ম্যাকারভের কাজ।

একদিন কেজিবির এক জেনারেল ও অ্যাঙ্গোলান ডিফেন্স মিনিস্টার এলেন তার প্রজেক্ট পরিদর্শনে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এসে হাজির এক দক্ষিণ আফ্রিকান লং রেঞ্জ পেট্রল। একটা হেলিকপ্টার প্রথমে চিহ্নিত করে জায়গাটা, তারপর এসে হাজির হয় দুটো জেট ফাইটার। ভয়ে আফ্রিকান সৈন্যরা পালিয়ে গেলেও ম্যাকারভ ঘাবড়ায়নি, নিজের অধীনে নিয়োজিত এক কোম্পানি কিউবান সৈন্য নিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

সেদিন তার কঠিন প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় দক্ষিণ আফ্রিকান পেট্রল, একটা কপ্টার ধ্বংস হয় তাদের। অ্যাঙ্গোলান মন্ত্রী আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান। কেজিবির জেনারেল ধরা পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেন ম্যাকারভকে। এর ক'দিন পরই প্রমোশন হয় তার, একইসাথে পদকও জোটে–অর্ডার অভ আলেক্সান্দার নেভেস্কি।

শেষের এই ঘটনাই মূলত ম্যাকারভের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল কবীর চৌধুরীকে। লংইয়ারবিয়েনের একমাত্র আবাসিক এলাকায় এসে পড়ল গাড়ির বহর। ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি এখানে। হারবার অতিক্রম করতেই আঁকাবাঁকা পথ, ক্রমে উঠে গেছে ছোটখাট এক পাহাড়ের চুড়োয়, ওখানেই গর্ভনর হাউস। দীর্ঘ, মজবুত কাঠের বিল্ডিং। নীল ফিওর্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় ওখান থেকে। এখন অবশ্য সৌন্দর্য বলে কিছু নেই ওখানে, পানি জমে শক্ত বরফ হয়ে আছে। নীল হয়ে গেছে সাদা।

ড্রাইভওয়েতে শীতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয়দের ছোটখাট একটা জটলা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল কবীর চৌধুরীর। লাম্বারজ্যাকেট আর পারকা পরে আছে মানুষগুলো, মাথায় ইয়ার ফ্ল্যাপওয়ালা ফারের টুপি। নীল ইউনিফর্ম পরা দুই নরওয়েজিয়ান সামাল দিচ্ছে তাদেরকে। বাকি দু'জন হাউসের বারান্দায় দুই রাশিয়ান পুলিসের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

সামাল দেয়ার জন্যে এই চারজন পুলিসই ছিল এতদিন। আজ আরও দশজন এসেছে দুই মন্ত্রীর সাথে।

জটলা নীরব। লোকগুলোর চাউনি সন্দেহজনক মনে হলো কবীর চৌধুরীর। তার কারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। বিক্ষোভ ধরনের কিছু আশঙ্কা করছিল সে, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বড়সড় কনফারেন্স রুমে মিলিত হলো দু'পক্ষ। প্রথমদিনের তুলনায় গভর্নরকে আজ বেশ আস্থাশীল মনে হলো তার। মানুষটা ছোটখাট। মুখটা একটু বাঁকা, প্রাচীন ভাইকিংদের মত। গালে চাপদাড়ি, মাথায় ঘন, প্রায় ক্রু-কাট্ চুল। পরনে ফর্মাল পোশাক। যদিও আজকের আলোচনায় তাঁর অংশ নেয়ার তেমন সুযোগ নেই। কথাবার্তা হবে অসলোর বিচার মন্ত্রীর সাথে। তিনিই সোয়ালবারের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

সৌজন্য প্রদর্শনে কার্পণ্য করলেন না গভর্নর প্রিবেনসেন সিসেলম্যান, কবীর চৌধুরী ও ম্যাকারভকে বসতে বললেন। কবীর চৌধুরী লোকটা যে-ই হোক, এ মুহূর্তে সে এখানে মস্কোর অফিশিয়াল প্রতিনিধি। খবরটা প্রায় সাতদিন আগে জানা হয়ে গেছে তাঁর। যেদিন অ্যারোফ্লোটের প্লেনে চড়ে রুশ বর্ডার ট্রুপস্ এল, সেদিন এয়ারফিল্ডে গিয়ে খবরটা জেনে আসতে হয়েছে। লোকটার নামে ক্রেমলিনের অথরাইজ লেটারও ওই একই প্লেনে এসেছে। সেটা পড়তে দেয়া হয়েছিল তাঁকে। সেদিন থেকেই লোকটা আসল পরিচয় জানা গেছে–ত্রিপাঠী নয়, কবীর চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এরকম ঘটনা একেবারেই অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত। রাজনীতিক তো নয়ই, এমনকি সোভিয়েত নাগরিকও নয় লোকটা। অদ্ভুত কাণ্ড! তবু বিষয়টা মেনে নেয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না সিসেলম্যানের। আজও নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাশে বসা বিচারমন্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি।

'আমরা এসেছি সোয়ালবারের ওপর নরওয়ের সার্বভৌমত্বের কথা নতুন করে ঘোষণা করতে,' আপোষহীন গলায় শুরু করলেন মন্ত্রী, 'এবং আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদেরকে সে কথা মনে রেখে বিশ্ব শান্তির খাতিরে অবিলম্বে এখান থেকে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানাতে। তবে অ্যারোফ্লোটের যে পাঁচজন গ্রাউন্ড কন্ট্রোল টীম মেম্বার আছে, তারা থাকতে পারবে। এ ব্যাপারে নরওয়ের কোন আপত্তি নেই। বরং আমরা তাদের নিরাপত্তা বিধান করব।'

আগে থেকে তৈরি একটা স্টেটমেন্ট ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল কবীর চৌধুরী। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে সে। বিবৃতিতে নরওয়েজিয়ান মন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেয়া হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিদের দখল থেকে সোয়ালবার আর্কিপেলাগো মুক্ত করতে রাশিয়ার আটত্রিশ হাজার বীর সৈনিক আত্মাহুতি দিয়েছিল। যুদ্ধের পর নরওয়েকে বিয়ার আইল্যান্ড দিয়ে দিয়েছিল রাশিয়া, বিনিময়ে সোয়ালবারে নরওয়ে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রশাসন পরিচলনা করবে বলে চুক্তি করেছিল নরওয়ে।

তারপরও এতবছর মস্কো সে চুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর

আটলান্টিক ও ব্যারেন্ট সী-তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার আগ্রাসী তৎপরতায় সে উদ্বিগ্ন। এই এলাকায় একাধিক ক্যারিয়ার জাহাজ মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যার অন্তত একটায় ক্রুজ মিসাইলও আছে। এই পরিস্থিতি সোয়ালবারের নিরাপত্তার জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে বলে মস্কো '৪৫ সালের চুক্তিকে কার্যকর করা জরুরী মনে করছে।

এ ছাড়া সেই চুক্তিতে আরও বলা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নরওয়ে যৌথভাবে সোয়ালবারের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করবে। যেহেতু নরওয়ে এতবছরেও সে ক্ষেত্রে কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি, সেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজটা এককভাবে করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এর ফলে নরওয়ের সার্বভৌমত্ব কোনমতেই লঙ্ঘিত হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যা করছে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রীটির আর্টিকেল তিনের অধীনে করছে।

পাল্টা আক্রমণ সেরে মুখ তুলল কবীর চৌধুরী। মস্কোর দাবির পুরোটা সত্যি নয়, খুব ভাল করেই জানে সে। আরও সত্যি যে প্যাঁচটা সে-ই লাগিয়েছে ইস্যুটাকে দীর্ঘায়িত করে দর কষাকষির সুবিধের জন্যে। একই সাথে নরওয়েকে বিভ্রান্তও করবে ভাষার মারপ্যাঁচ। সেটা ঘুচাতে হলে অসলোকে হেগের ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের আশ্রয় নিতে হবে, যদি সে চায়। জানা কথা, কম করেও পাঁচ বছর লাগবে সেখান থেকে রায় পেতে।

বিচার মন্ত্রী চুক্তিটিকে অস্বীকার করতে চাইলেন তাঁদের পার্লামেন্ট স্টরটিং অনুমোদন করেনি বলে। 'আপনাদের স্টরটিঙের গাফিলতির জন্য মস্কো দায়ী নয়,' জবাব দিল সে। 'তার দৃষ্টিতে চুক্তি চুক্তিই। নরওয়ের রাজা হয়তো ভুলে গেছেন পঁয়তাল্লিশে নাজিবাহিনী কি ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়েছিল সোয়ালবারে। কিন্তু রাশিয়া সে কথা ভোলেনি, কারণ এই মাটিতে তার আটত্রিশ হাজার বীর সন্তানের রক্ত মিশে আছে। কাজেই, মার্কিন নৌ-বহর এই অঞ্চল থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত সোয়ালবার নিরাপদ, মস্কো তা মানতে রাজি নয়।

ভুরু কুঁচকে উঠল কর্নেল ম্যাকারভের, কবীর চৌধুরীর গলার স্বরে এবার কড়া ঝাল ছিল টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। কেমন যেন বেমানান লাগল তার। মনে হচ্ছে আমেরিকার ওপর কোন কারণে খেপে আছে লোকটা। সত্যি, নাকি তার কল্পনা? কিন্তু মানুষটার চেহারা দেখে তা মনে হলো না ম্যাকারভের। রাগে তেতে আছে তার বড়সড় মুখটা, চাউনিও ঘোলাটে। ব্যাপারটা কি?

নিজেকে সামলাল সে। হোক্‌গে যা খুশি, তাতে আমার কি? তাদের হয়ে গোটা বিশ্বকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে লোকটা, কাজেই···ভাবনার গাড়ি বাম্প করল ম্যাকারভের। এই কাজটা আমরাই করতে পারতাম, তাহলে···কবীর চৌধুরীর গলা শুনে সচকিত হলো সে।

'তবে আমরা এ কথাও জোর দিয়ে ঘোষণা করছি,' বলল সে। 'সোয়ালবারের ব্যাপারে মস্কো যে পদক্ষেপই নিক, নরওয়ের সাথে আলোচনা করেই নেবে। এবং নরওয়ের সরকারের যে সমস্ত বিধি নিষেধাজ্ঞা আছে এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে, তার প্রতিটার ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল থাকবে।'

এই আরেকটা ডাহা মিথ্যে, ভাবল ম্যাকারভ। মনে মনে হাসল।

অসহায় দেখাল বিচার মন্ত্রীকে। কিন্তু মাত্র চোদ্দজন পুলিস নিয়ে প্রায় দুশোর বিরুদ্ধে করার কিছু নেই। মীটিঙের শেষ পর্যায়ে যখন বলা হলো আশপাশের অন্যসব নরওয়েজিয়ান সেটলমেন্ট–নি অ্যালেসান্ড, সভিয়া এবং ইসকিওর্ডের মোহনার রেডিও স্টেশনের নিরাপত্তার জন্যেও রুশ পুলিস মোতায়েন করা হবে, মৌখিক আপত্তিও জানালেন না মন্ত্রী।

চার ঘণ্টা পর অসলো ফিরে গেল ডেলিগেশন। আরেক দফা চোস্ত গার্ড অভ অনার জানানো হলো তাদেরকে। প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে মুখ তুলে প্লাটা বেরগেটের সমতল চুড়োর দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। গাঢ় আকাশের পটভূমিতে ধপধপে সাদা একটা রেখার মত দেখাচ্ছে ওটাকে। সেদিকে তাকিয়ে কিছু বলল সে, জেটের গর্জনে শুনতে পেল না ম্যাকারভ।

'কিছু বলছেন, স্যার?'

'সূর্য উঠতে এখনও অনেকদিন বাকি, পলকভনিক,' বলল সে। 'কিন্তু অতদিন দেরি করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি কালই প্লাটা বেরগেটে উঠবেন। রাডারের জন্যে সাইট বাছাই করে রাখতে হবে। 'আমি অবশ্য একবার উঠেছিলাম,' শ্রাগ করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু আমি এঞ্জিনিয়ার নই। আপনাকে যেতে হবে।'

'রাইট, স্যার।'

'রাডার এক্সপার্টরা খুব শীঘ্রি আসবে।'

সে রাতে নিজের হোটেল রুমে ফিরে কাগজ কলম নিয়ে বসল ম্যাকারভ। লেনিনগ্রাদে থাকে তার সিভিল সার্ভেন্ট স্ত্রী, সুন্দরী সভেতলানা, তাকে চিঠি লিখতে হবে। তাদের একমাত্র সন্তান, এগারো বছরের আলেক্সেইকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসার সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে।

সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করে লিখতে শুরু করল ম্যাকারভ। মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে শেখা কষ্টসাধ্য ভাষায় সোয়ালবার প্রসঙ্গে লিখল। এভাবে লেখার কারণ, সে খুব ভাল জানে প্রতিটা চিঠি তার দেশে সেন্সর হয়। কেজিবির একটা বিশেল সেল আছে এ জন্যে, বর্ডার পুলিসের অফিসার বলে তাকে রেহাই দেবে না ওরা।

বেশ বড় হলো চিঠিটা, কিন্তু তখনই ওটাকে খামবন্দী করল না সে। রেখে দিল সকালের জন্যে। যদি নতুন কিছু মনে পড়ে, শেষ অংশে জুড়ে দেবে কাজে যাওয়ার আগে।

প্র্যাকটিস।

১৯০৫ সালে আমেরিকান পর্যটক লংইয়ার যে উপত্যকায় তার কোল কনসেশন খুলেছিল, সেটা বড়জোর আড়াই মাইল দীর্ঘ। এখন সেখানে রুশ পুলিস টহল দেয় চব্বিশ ঘণ্টা। সদাসতর্ক।

দুই সারি পাহাড়ের মধ্যেকার ইসফিওর্ডের কাছে পৌঁছে ঢালু হয়ে উঠে গেছে সেটা। মাইন শ্যাফটগুলো ওটার তলা দিয়ে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে গেছে। শেষ হয়েছে আরেক পাহাড়ের চুড়োর কাছে। ওটার দু'দিকে দুটো গ্লেসিয়ার। গ্লেসিয়ার

থেকে নেমে আসা পানির ধারা দু'ভাগ করে ফেলেছে উপত্যকাটিকে। ধারার দুদিকে দুটো রাস্তা–একটা এসেছে এয়ারফিল্ড ও কী (Quay) থেকে, অন্যটা অ্যাডভেন্টডালেন নামের আরেক বড় উপত্যকা থেকে। গভর্নরের অফিস ও চার্চ প্রথমটার দিকে। বাকি সব ঘরবাড়ি, মাইনারস' অ্যাকোমোডেশন ব্লক অন্যটার দিকে।

অসলোর ডেলিগেশন চলে যাওয়ার দুদিন পরের ঘটনা। অ্যাডভেন্টডালেনের দিক থেকে আসা রাস্তার পাশের এক রুমের অ্যাপার্টমেন্টে নাস্তা করছে একত্রিশ বছরের মাইনিং সার্ভেয়র পল মিডল্যান্ড। কান খাড়া, অসলো রেডিওর সকালের খবর শুনছে। জানালা দিয়ে প্লাটা বেরগেটের চুড়ো দেখতে পাচ্ছে সে। নিচের আলোঝলমলে মাইনের মূল প্রবেশ পথও।

নজর সেদিকে থাকলেও কান ও মন, দুটোই খবরের দিকে রয়েছে মিডল্যান্ডের। বিশেষ একটা সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে সে। পেলেই কাজে লেগে পড়বে। একটু পরই পাওয়া গেল সঙ্কেত, খাওয়া থামিয়ে বসে থাকল সার্ভেয়র। একটা বাক্য কৌশলে দু'বার পড়েছে পাঠক, অর্থাৎ রিপিট করেছে। এই রিপিটেশনের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। সেটা এরকম: সোর্সেস ইন সোয়ালবার গ্রোইং ডিসকন্টেন্ট ইন দ্য মাইনিং কমিউনিটি দেয়ার। দ্য জাস্টিস মিনিস্ট্রি অ্যাপিলস টু অল সিটিজেনস্ টু রিমেইন কাম। নাথিং শুড বি ডান টু প্রেজুডিস নেগোসিয়েশন। দ্য মিনিস্ট্রি আস্কস আস টু রিপিট দিস অ্যাডভাইস। নাথিং শুড বি ডান টু প্রেজুডিস নেগোসিয়েশন।

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলো মিডল্যান্ডের, রেডিও অফ করে সেরিয়ালের বাউল ঠেলে সরিয়ে দিল সে। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্ব-পরিকল্পিত সঙ্কেতটা প্রচারিত হয়েছে নরওয়েজিয়ান আর্মির স্থানীয় তিনজনের আন্ডারগ্রাউন্ড ইন্টেলিজেন্স সেলের উদ্দেশে। তাদের অ্যাকশনের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সেলের একজন সে নিজে, অন্য দু'জনের একজন মাইন ফোরম্যান, হাকুন। শেষেরজন মেয়ে, অ্যানি। স্থানীয় ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সেলের রেডিও অপারেটর সে। এরা তিনজন কখনোই একত্রিত হয় না নিরাপত্তার স্বার্থে।

১৯৭৮ সালে শেষবার অ্যাকটিভেট করা হয়েছিল সেলটাকে, যখন ব্যারেন্টসবার্গে রুশ হেলিকপ্টার বেজ নির্মাণ করা নিয়ে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আজ রাতে মিনিয়েচারাইজড্ এজেন্ট রেডিওর মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলীয় বোডো শহরের ডিফেন্স কমান্ড ফর নর্থ নরওয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তাদেরকে। ওটার সাহায্যে সেকেন্ডেরও কম সময়ে কোডেড মেসেজ ট্রান্সমিট করতে পারে অ্যানি। একেবারে আনডিটেকেটবল্ নয় ওটা, খুব সফিস্টিকেটেড মনিটরিং সিস্টেম হলে পিক করে ফেলতে পারবে মেসেজ, সে যত সংক্ষিপ্তই হোক। তবু পাঠাতে হবে, উপায় নেই।

ঘটনা তাহলে দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে, মনে মনে বলল মিডল্যান্ড। সে জানে, এখানে রাশিয়ান আগ্রাসন প্রতিহত করতে কমান্ডো হামলার প্ল্যান প্রায় পাকা হয়ে গেছে, সেটা যাতে সফল হয়, সেজন্যে এখন কাজ করতে হবে তাদেরকে। এই মিশনের নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে, নরওয়েজিয়ান আর্মির

স্পশাল রিজার্ভ শাখা স্কিয়েগার-এর ক্যাপ্টেন পল মিডল্যান্ডকে।

প্রত্যেকটা দেশেরই বিশেষ বাহিনী থাকে, বিশেষ সময়ে যার ডাক পড়ে। এর সদস্যরা ফিজিক্যাল ফিটনেস, সাহস, বুদ্ধি ইত্যাদিসহ সবদিক থেকে হয় সেরা। নরওয়েরও আছে–যার নাম স্কিয়েগার ও ফলশ্রিময়েগার–প্যারাশুটিস্ট। এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা মাত্র ১২০, এর তিন ভাগের এক ভাগ রেগুলার আর্মিতে আছে। অন্যরা তার মত রিজার্ভিস্ট। ১৯৪০ পর্যন্ত নিরপেক্ষ দেশ ছিল নরওয়ে, ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় জার্মান আগ্রাসনের মুখে নাকাল হতে হয়েছে। সে অবস্থায় আর পড়তে চায় না তারা, তাই দেশের প্রতিটা সীমান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রিজার্ভিস্টরা।

চারদিন আগের কথা ভাবল পল মিডল্যান্ড। কাছের নি অ্যালেসান্ডে যেতে হয়েছিল তাকে একটা খনি সার্ভে করতে। ওখান থেকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে বুঝতে পেরেছে অন্য কাজে ডাকা হয়েছে তাকে। পথের মাঝে আরেক বোট এসে ভিড়েছিল তার বোটের গায়ে, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। অচেনা এক লোক এক কোডেড মেসেজ ধরিয়ে দেয় হাতে। ওতে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। আজকের রেডিও সঙ্কেতটা ছিল ফাইনাল নির্দেশ।

কোন সমস্যা নেই। এখানে সে একজন ক্লীন শেভড, হ্যান্ডসাম, ইয়াং ইগজেকিউটিভ। কাজের সময় কাজ আর অবসরে ক্রস-কান্ট্রি স্কি করে কাটায়। বাদামী চুল তার, চোখের রং ইসফিওর্ডের পানির মত নীল। এখানকার প্রত্যেকে চেনে তাকে, উপযুক্ত সম্মানও করে।

নাস্তার বাসন-কোসন ধুয়ে জায়গামত সাজিয়ে রেখে পারকা গায়ে দিয়ে নিল মিডল্যান্ড। সন্ধেয় অ্যানির সাথে দেখা হবে ভেবে খুশি। ওকে খুব ভাল লাগে তার। যদি নিরাপত্তার সমস্যা না থাকত, তাহলে মেয়েটার সাথে ডেটিং করত সে।

চারটায় অফিস থেকে বের হয়ে ব্যাঙ্কের দিকে চলল। একটু দূরেই ওটা, একটা লালচে দোতলা বিল্ডিঙের পর ছোট কিন্তু চমৎকার কাঠের ভবনে। গেটের ওপরে বড় এক সাইন:TROMS SPAR BANK.

ভেতরটা অন্ধকার, বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাঙ্ক। মিডল্যান্ডও তাই আশা করছিল। ভবনটার পাশে ঝলমলে এক খুদে সুপার মার্কেটে ঢুকে পড়ল সে। ওখানেও নেই অ্যানি। কাজেই ওর বাসার দিকে চলল সে। ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে তারই মত এক কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মেয়েটা। সুন্দর সাজানো-গোছানো।

'চমৎকার!' চারদিকে নজর বুলিয়ে প্রশংসা করল পল মিডল্যান্ড। 'খুব সুন্দর করে সাজিয়েছ ঘরটা।'

'ধন্যবাদ,' বলল অ্যানি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এক। মিডল্যান্ডের মত তার চুলও বাদামী, চোখের রং নীল। ভরাট দেহ। মুখটা ডিম আকৃতির। খাড়া, একটু ছোট নাক। যে কোন পুরুষের বুকে কামনার আগুন ধরাতে পারে মেয়েটা। এক পীস কেক ও গরম কফি দিয়ে মিডল্যান্ডকে আপ্যায়ন করল সে। সরাসরি কাজের কথা পাড়ল।

'সকালের ব্রডকাস্ট শুনেছি আমি। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।'

ওয়ান-টাইম প্যাডে লিখে আনা কোডেড মেসেজটা তার হাতে তুলে দিল

সে। ওটায় চোখ বুলিয়ে কাবার্ড থেকে একটা সুটকেস বের করল অ্যানি। ওটা খুলে কাপড়-চোপড়ের ভেতর হাত গলিয়ে ছোট্ট একটা রেডিও বের করে আনল। ওটার হাতখানেক দীর্ঘ এরিয়েল তুলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মেসেজ ট্রান্সমিট করল। একেবারে সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাজটা করল অ্যানি, যেন কোন বন্ধুকে টেলিফোন করছে।

সতর্ক, প্রস্তুত ছিল বোডোর অপারেটর। দু'মিনিটের মধ্যে জবাব এল। ওটাকে ডিকোড করে নীরবে অ্যানির হাতে তুলে দিল মিডল্যান্ড। পড়ল সে ওটা, মাথা ঝাঁকাল। 'আমি কথা বলব ফ্রেডারিক ফলভিকের সাথে। এয়ারফিল্ডের যাবতীয় খবর পাওয়া যাবে লোকটার কাছে। ওদের ওপর ভীষণ খেপে আছে সে, নিশ্চই সাহায্য করবে আমাদেরকে।'

মাথা দোলাল পল মিডল্যান্ড। 'ঠিক আছে, কিন্তু সাবধানে।'

ছয়

নরফোক, ভার্জিনিয়া। রাহাত খান ফিরে যাওয়ার চারদিন পরের কথা।

SACLANT অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিঙের মুখোমুখি বসে আছে রানা ও সোহানা। ভাইস-অ্যাডমিরাল ফ্র্যাঙ্ক শিপলেকও আছেন।

'লংইয়ারবিয়েনে নরওয়েজিয়ান প্যারাশুটিস্টদের তিন সদস্যের একটা স্লীপার সেল আছে,' রানার প্রশ্নের জবাবে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটাকে অ্যাকটিভেট করা হয়েছে। আশা করছি কালকের মধ্যে ওখানকার যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে এসে যাবে। অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু তথ্য পেয়েও গিয়েছি।'

সামনে রাখা একটা ফাইলে চোখ বোলালেন তিনি। 'আমাদের স্যাটেলাইটের পাঠানো নতুন কিছু ছবি আর তথ্য এসেছে। তাতে জানানো হয়েছে, এয়ারফিল্ডের কাছের এক পাহাড়ে রুশদের একটা সার্ভে টীমের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। ওটার নাম প্লাটা বেরগেট। বোঝা যাচ্ছে ওখানেই রাডার বসাতে যাচ্ছে ব্যাটারা। নরওয়ের প্রতিবাদ, কূটনৈতিক তৎপরতা, কোনকিছুতেই কাজ হচ্ছে না।'

'গত পরশু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সোয়ালবার ডিবেট থেকে উঠে চলে গেছে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত,' বললেন শিপলেক। 'বলে গেছে, এটা তাদের আর নরওয়ের সমস্যা, তারাই মিটিয়ে ফেলতে পারবে। জাতিসংঘের মোড়লীর দরকার নেই।'

মাথা দোলাল রানা। 'পত্রিকায় পড়েছি।'

'নরওয়ে?' সোহানা বলল। 'ওরা কোন কড়া স্টেপ...'

'সাহস পাচ্ছে না,' শিপলেক বললেন। 'বেশি চাপাচাপি করলে ওটা পুরোপুরি বেদখল হয়ে যাবে আশঙ্কা করছে অসলো। এখন আর কোন উপায় নেই, যা করার বাঁকা আঙুলেই করতে হবে, মেজর।'

'আমি একটা সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছি,' বলল রানা। 'তার সাথে একটা আশঙ্কার কথাও।'

নড়েচড়ে বসলেন দুই বৃদ্ধ, চেহারায় কৌতূহল। 'বলুন, প্লীজ!' কিং বললেন। 'প্রথমে আশঙ্কার ব্যাপারে বলুন।'

'উরসুলার কথা নিশ্চই মনে আছে আপনাদের?'

মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত দেখাল তাঁদেরকে। 'উরসুলা?' কিং বললেন।

'ব্রাসেলসের ন্যাটো হেড অফিসের ক্লার্ক,' গম্ভীর হলো রানা। 'বিরাশি সালে ওখানকার কিছু ইম্পর্ট্যান্ট ডকুমেন্টস্ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।'

'ও, হ্যাঁ। মনে আছে, তাই কি ভোলা যায়?' সমর্থনের আশায় শিপলেকের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু সে কথা কেন?'

'মিশনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তুলতে হলো,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল রানা। 'আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে গোপনীয়তার ওপর। প্লাটা বেরগেটে গিয়ে আচমকা রাশিয়ান রিসেপশন কমিটির সামনে পড়তে চাই না আমি। কাজেই...'

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা, মেজর,' বাধা দিয়ে বললেন কিং। 'সেরকম কিছু ঘটলে আমরাও কঠিন সমস্যায় পড়ব। এ ব্যাপারে ব্রাসেলস্ আর অসলোকে আগেও একবার সতর্ক করা হয়েছে। তবু আপনি যখন কথাটা তুললেনই, আজ আরেকবার সতর্ক করা হবে। বি শিওর অ্যাবাউট দ্যাট।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, অ্যাডমিরাল। এবার অন্য প্রসঙ্গ।'

লংইয়ারবিয়েন। নিজের কন্ট্রোল টাওয়ার অফিসের জানালা দিয়ে প্লাটা বেরগেটের চুড়োর দিকে তাকাল কর্নেল ম্যাকারভ। দীর্ঘদিন পর তার ওপরের জমাট মেঘে ভাঙন ধরেছে। এখন আর নিরেট নেই মেঘ, জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে, আলগা হয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো সে। রিসিভার তুলল। 'দা?'

'আজকের দিনটা পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত মনে হচ্ছে,' কবীর চৌধুরীর গলা ভেসে এল। 'এখনই তৈরি হয়ে নিন। দুপুরের মধ্যে পৌঁছতে পারলে বিকেলে ফিরে আসতে পারবেন সার্ভে সেরে।'

'রাইট, স্যার।'

'আর হ্যাঁ, ফিরতে দেরি করবেন না। সন্ধের আগে এখানে দরকার হবে আপনাকে।'

'রাইট, স্যার!' রিসিভার রেখে দিল ম্যাকারভ।

আধঘণ্টার মধ্যে এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের চারজনের এক সার্ভে টীম ও একদল ট্রুপারসহ দুটো এম আই-এইট কপ্টারে চড়ে এয়ারফিল্ড ত্যাগ করল সে। খুব দ্রুত, কোনাকুনি উঠে যেতে শুরু করল ওগুলো।

অবাক বিস্ময়ে দ্রুত নেমে যেতে থাকা আকাশছোঁয়া পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাকারভ। অনেক উঁচুতে বাউল আকৃতির প্রকাণ্ড এক প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখতে পেল পাহাড়ের গায়ে, একটা মাইন আছে ওখানে। কিছু

বিল্ডিংও। তার ওপরের বরফমোড়া পাথর একদম খাড়া হয়ে উঠে গেছে। কপ্টার খানিকটা দক্ষিণে সরে আসতে বিশাল V আকৃতির এক উপত্যকা দেখতে পেল সে, একেবারে চুড়োয় গিয়ে ঠেকেছে।

ওটার নাম ব্লমস্টারডালেন, ভাবল ম্যাকারভ। ফলভিক বলেছিল। গ্রীষ্মে ওখানেই ফোটে বুনো ফুল। ল্যান্ডস্কেপ দেখায় মন দিল, নিচের প্রশস্ত ফিওর্ড এয়ারফিল্ড ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে। এরকম এক জায়গায় রাডার কি সাংঘাতিক কাজে দেবে, তা বুঝতে এক্সপার্ট হওয়ার দরকার হয় না।

সমতল চুড়োয় ল্যান্ড করল কপ্টার। ধারাল, প্রবল বাতাসের ঝাপ্টা সামলে নেমে পড়ল ম্যাকারভ, চারদিকে তাকাল। পুরোপুরি সমতল নয় জায়গাটা, তবে তাদের কাজের জন্যে যথেষ্টর চেয়েও বেশি সমতল। প্রায় টেবিল টপের মত। আড়াই মাইল দীর্ঘ ও আধমাইল প্রস্থ, মাঝখানটা উটের পিঠের মত উঁচু, নইলে প্রায় সমতলই বলা চলে। তীব্র বাতাসের কারণে বরফ বেশি পুরু হয়ে জমতে পারে না এখানে, বেশিরভাগই উড়ে যায়।

আল্টিমিটারের ওপর চোখ বোলাল কর্নেল–পনেরোশো ফুট ওপরে রয়েছে তারা। প্রচণ্ড হিম বাতাসের কারণে নিচের তুলনায় তাপমাত্রা আরও পাঁচ ডিগ্রী কম এখানে–বিলো থার্টি ওয়ান। শরীর গরম রাখার জন্যে লেফট-রাইট করতে লাগল কর্নেল। তার পিছনে, দক্ষিণে, বিশাল এক রিজ। প্লাটা বেরগেট থেকে আরও দেড় হাজার ফুট উঁচু।

'ওটার ওপর বসালে মনে হয় আরও ভাল হত,' রিজটা দেখাল সে। 'এটার চেয়ে অনেক উঁচু ওটা।'

'কোন প্রয়োজন নেই, কমরেড পলকভনিক,' বলল সার্ভে দলের নেতা ইয়াকুশকিন। 'ওটা আমাদের দক্ষিণের বাধা। সে জন্যে কোন সমস্যা হবে না আমাদের।' হাত তুলে উল্টোদিক দেখাল। 'আমেরিকার দিকটা খোলা থাকলেই চলবে। এখানে বসালে অন্তত চারশো মাইল দূরে থাকতে ওদের ক্রুজ মিজাইল বা লো-ফ্লাইং প্লেন আইডেন্টিফাই করতে পারবে আমাদের রাডার।'

ওপরের পরিস্থিতি ভাল করে বুঝে নিল ম্যাকারভ। আসল কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই ক্যাম্প করতে হবে এখানে, নইলে আবহাওয়া বিগড়ে গেলে নির্মাণ শ্রমিকরা বিপদে পড়ে যাবে।

'কবে নাগাদ কন্সট্রাকশন শুরু করা যায়?'

'গ্রীষ্মে হলে সবচে' ভাল হয়, কমরেড পলকভনিক,' ইয়াকুশকিন বলল। 'বরফ গলে গেলে নিশ্চিন্তে কাজ করা যেত।'

'তা যেত, কিন্তু আমাদের হাতে অত সময় নেই,' পা ঠুকতে ঠুকতে বলল ম্যাকারভ। 'গ্রীষ্ম এসে যাতে এখানে রাডার দেখতে পায়, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।'

ফিরে এসে অফিসে তার খাবার পৌঁছে দেয়ার অর্ডার দিল সে, তারপর রাডারের জন্যে কি ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়া যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল। প্লাটা বেরগেটের তিনদিকে রয়েছে দুরারোহ ক্লিফ। মাউন্টিনিয়ারদের জন্যে নয় অবশ্য, তারা চেষ্টা করলে উঠতে পারবে। কিন্তু তাতে তাদের কারও না

কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে, কেন না ওই তিনদিক খোলা।

কেবল দক্ষিণদিক, যেদিকে উঁচু রিজটা রয়েছে, সেদিক থেকে সবার অলক্ষে আসতে পারে শত্রু। ওটা থেকে রাডারের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। মাঝে সমতল ভূমি। অথবা বরফ আর তুষারমোড়া প্রান্তরও বলা যায়। ওই পথে যদি কেউ আসতে চায়, কঠিন হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে, তাহলে ওই প্রান্তর হবে তার বা তাদের বধ্যভূমি।

নিজের অফিসে বসে আছে কবীর চৌধুরী। নজর বাইরে। এইমাত্র দুটো এমআই-এইট উড়ে যেতে দেখেছে সে, প্লাটা বেরগেট গেছে পলকভনিক ম্যাকারভ। আর কয়েকদিনের মধ্যে রুশ আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসে যাবে ওখানে, তারপর আমেরিকার মোড়লগিরি চিরদিনের মত খতম হয়ে যাবে, ভাবছে সে। স্রেফ কাগুজে বাঘে পরিণত হবে দেশটা।

পারমাণবিক বোমার বিশাল মজুত, মিসাইল, অত্যাধুনিক বিমান বহর, নৌ-বহর, সেনাবাহিনী, বেকার হয়ে যাবে সবকিছু। কিছুই করার থাকবে না আর ওদের। এমনকি দর কষাকষির সুযোগটাও না। সব তখন একচেটিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে যাবে। সামরিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে আর মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ তখন 'ভারসাম্য' বলে কিছু থাকবে না। এতদিন নিজেকে পশ্চিমের হর্তাকর্তা-বিধাতা ভাবত আমেরিকা। দু'দিন পর…ক্রূর হাসি ফুটল কবীর চৌধুরীর মুখে।

আগুন নিয়ে খেলা কত বিপজ্জনক, এবার টের পাবে বাছাধনেরা। কবীর চৌধুরীর পথে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ফল কত ভয়াবহ, হাড়ে হাড়ে টের পাবে। এই জন্যেই রুশ আগ্রাসনের পর নিজের পরিচয় প্রকাশ পেতে দিয়েছে সে, লংইয়ারবিয়েনের ঘটনার নায়ক কে, ওদেরকে তা ভালমত বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে শেষমেশ যা করার স্বনামে করছে। এখন নিশ্চয়ই হায় হায় করবে ওরা, ভাবল সে, নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়বে। তাকে ঘাঁটিয়ে নিজেদের কতবড় সর্বনাশ করেছে বুঝতে পেরে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা ভাবতে গিয়ে বিতৃষ্ণা ফুটল তার চেহারায়। এই দেশটাকে কখনোই সহ্য করতে পারে না সে। মনে হয় বুঝি উল্টো গাধার পিঠে চড়ে চলছে দেশটা, চালাচ্ছে হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীরা। সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে পাল্লা দেয়া ছাড়া যেন ওদের আর কোন কাজ নেই।

মুখে মুখে সমাজতন্ত্রী আর তলে তলে সুবিধাবাদী এই দেশটির সাথে গাঁটছড়া বাঁধার কোন ইচ্ছে ছিল না তার, ওই চিন্তা মাথায়ই আসেনি কখনও। স্রেফ টাকার প্রয়োজনে কাজটা করেছে সে।

অবশ্য প্রথমে ওরা যে তাকে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মস্কোর সাহায্য না পেলে লংইয়ারবিয়েনে টিকে থাকতে পারত না কবীর চৌধুরী। সেই সূত্রেই মন্ত্রী স্টোলিপিন ও অন্য কয়েকজন পলিট ব্যুরো সদস্যের সাথে পুরানো বন্ধুত্ব…কি বলে? নবায়ন?…হ্যাঁ, নবায়ন করে নেয়ার

সুযোগ পেয়েছে সে।

প্রথম প্রথম কাজের পর সময় কাটতে চাইত না বলে পত্র-পত্রিকা পড়তে এখানকার পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করত কবীর চৌধুরী। পড়াশুনা করে সময় কাটাত। ওখানে পুরানো ম্যাগাজিন-গেজেট ইত্যাদি ঘাঁটতে গিয়ে সোয়ালবারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তির ফাঁকটা যখন প্রথম চোখে পড়ে, তখন খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি সে। দিয়েছে পরে। ফাঁকটা খুবই বড় এবং সেটা মস্কোকে পূরণ করার সহজ পথ বাতলে দিয়ে বেশ বড় অঙ্কের একটা দাঁও মারা সম্ভব, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে।

এরপর উঠেপড়ে লাগে কবীর চৌধুরী, লন্ডনের এক কাটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে ১৯৪৫ সালের পর থেকে সোয়ালবার সম্পর্কে পত্রিকায়-ম্যাগাজিনে যত খবর ছাপা হয়েছে, সবগুলোর কপি জোগাড় করে নতুন উদ্যমে কাজে লেগে পড়ে। তারপর ঘনঘন মস্কো যাওয়া-আসা শুরু করে। প্রতিবারই বন্ধুদের জন্যে দামী দামী উপহার নিয়ে গেছে।

তাদের সাথে সম্পর্ক ভালই ছিল কবীর চৌধুরীর, এর ফলে তা আরও বাড়ল। তারপর সময় বুঝে বিষয়টার সূত্রপাত ঘটাল সে। মস্কোর কাছে পেরেদেলকিনো নামের এক জায়গায় বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা সরকারী অবসর যাপন কেন্দ্র 'দাচা' কমপ্লেক্সে নিজের দাচায় ছুটি কাটাচ্ছে তখন সমর মন্ত্রী স্টোলিপিন, কবীর চৌধুরীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

এ ব্যাপারে তাকে একান্তে আভাস দিয়েছে সে ওর দাচায় গিয়ে। জানিয়েছে, যদি সে তাকে সাহায্য করে, তাহলে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার কমিশন পাবে। অঙ্কটা শুনে সেই যে হাঁ হয়ে গেল মন্ত্রী, প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে সেটা বন্ধ হতে। এরপর নিজের দাবিটা বিশদভাবে জানিয়েছে কবীর চৌধুরী।

দেশকে একক পরাশক্তিতে পরিণত করতে মস্কোর কাছে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার কোন ব্যাপারই নয়, কিন্তু তা কি আসলেই সম্ভব? খুবই সম্ভব। কি করে? সেটা শোনার আগে সোভিয়েত সরকারকে তার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে চুক্তিটা লোক মারফত লন্ডনে নিজের উকিলের কাছে পাঠিয়ে দেবে কবীর চৌধুরী। সাতদিন অথবা পনেরো দিনের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকবে, এরমধ্যে যদি সে উকিলের সাথে যোগাযোগ না করে, তাহলে দলিল ফাঁস করে দেবে সে। শুধু তাই নয়, সেই সাথে দাবির অর্ধেক টাকা তার নাসাউ অ্যাকাউন্টে জমাও দিতে হবে। সে যখন নিশ্চিত হবে টাকা জমা হয়েছে এবং দলিল লন্ডনে পৌঁছেছে, তখন প্ল্যান জানাবে। প্রয়োজনে তা কার্যকর করতে সহযোগিতাও করবে।

যদি প্ল্যান পছন্দ না হয়? সে প্রশ্নই আসে না। বরং শোনার সাথে সাথে সেটাকে কার্যকর করতে উঠেপড়ে লাগবে মস্কো। কাজ হয়ে গেলে বাকি টাকা দিতে হবে, তখন দলিল ফেরত দেবে সে। পুরো টাকাটা যাতে সে পায়, সে জন্যে স্টোলিপিনকে মধ্যস্থতা করতে হবে। মধ্যস্থতার বিনিময়ে পঁচিশ মিলিয়ন পাবে সে।

প্রস্তাবটা জায়গামতই রেখেছিল কবীর চৌধুরী। সমর মন্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট

প্রভাবশালী ছিল লোকটা পলিট ব্যুরোয়, তারওপর প্রেসিডেন্টের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর। সেই সাথে ব্যুরোর আরেক প্রভাবশালী সদস্য, কেজিবি প্রধান আলেক্সেই রতমিস্ত্রভের স্কুল জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তাছাড়া সে সময় প্রেসিডেন্টের অতীতের কিছু ভুল পদক্ষেপের মাসুল গুনতে হচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে, পলিট ব্যুরোয় তার সমর্থক সদস্যের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমতে শুরু করেছে। গোপন ভোটে দেখা গেছে এগারো সদস্যের ব্যুরোর পাঁচজনই তার বিপক্ষে চলে গেছে, অন্য পাঁচজন পক্ষে। সৌভাগ্য যে নিজের ভোট ছিল, সেটা প্রয়োগ করে ৬-৫ ভোটে কোনমতে সে যাত্রা রেহাই পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

এই সময় একদিন প্রেসিডেন্টের কাছে কবীর চৌধুরীর প্রস্তাবের কথা তুলল স্টোলিপিন। সেখানে তখন আরও একজন ছিল, সে কেজিবি প্রধান রতমিস্ত্রভ। প্রেসিডেন্টের তখন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, এমন অবস্থা। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো কবীর চৌধুরীর দাবির টাকা এবং চুক্তির দলিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে।

সমর মন্ত্রীর মত কেজিবি প্রধানও প্রেসিডেন্টের শুভাকাঙ্ক্ষী। দুজনেই তাকে বোঝাল, কবীর চৌধুরী ফালতু কথার মানুষ নয়। সুতরাং তাঁকে রাজি হয়ে যেতে অনুরোধ করল তারা। বলল, কাজটা সে যেমন দাবি করছে, যদি সত্যি তেমন হয়, তাহলে লেলিনের চেয়েও বড় নেতায় পরিণত হবেন তিনি রাতারাতি।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর রাজি হলেন প্রেসিডেন্ট। এতবড় অঙ্কের টাকা, পলিট ব্যুরোকে না জানিয়ে দেয়ার উপায় নেই। অতএব বৈঠক ডাকা হলো, তোলা হলো খরচের প্রস্তাব। কিন্তু কিসের খরচ, তা বলা হলো না। বলা হলো 'মহান পিতৃভূমির' কল্যাণে খরচ হবে। এ নিয়ে ডিবেট হলো, সদস্যদের মতিগতি দেখে বোঝা গেল বেশিরভাগই সন্দেহে ভুগছে, প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে কিনা, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

তাদেরকে মনস্থির করতে সাহায্য করল সমর মন্ত্রী ও কেজিবি প্রধান। ব্যক্তিগত ভাবে দেন-দরবার করে তাদেরকে বোঝাতে লাগল পক্ষে ভোট দিতে। তারপরও অল্প মার্জিনে পাস হলো প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব, ৭-৪ ভোটে। প্রেসকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হলো।

দলিল আর দশ বিলিয়ন ডলারের চেক তুলে দেয়া হলো কবীর চৌধুরীর হাতে, ওগুলোর খাঁটিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুখ খুলল সে। তারপর···রাষ্ট্রীয় কমিশারি থেকে আসা সেরা রুশ ভোদকার বন্যায় ভেসে গেল পলিট ব্যুরোর সভাকক্ষের টেবিল-ফ্লোর, পিঠ চাপড়ানির ঠেলায় পিঠ ব্যথা হয়ে গেল কবীর চৌধুরীর।

তাকে অনুরোধ করা হলো যেন রাডার ইনস্টল না হওয়া পর্যন্ত মস্কোর স্বার্থ দেখাশুনা করে। বাকি টাকা কাজটা হয়ে গেলেই দেয়া হবে। আপত্তির কোন কারণ নেই, রাজি হয়ে গেল সে।

কয়েকটা কারণে রাশিয়ার কাছে সোয়ালবার আর্কিপেলাগোর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তার খুব কাছেই কোলা

পেনিনসুলা, সোভিয়েত নর্দার্ন ফ্লীটের ঘাঁটি। শুধু সে দেশের নয়, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি–বড় বড় যত যুদ্ধজাহাজ আছে তার প্রায় অর্ধেক, সবচেয়ে অ্যাডভান্সড্ ব্যালিস্টিক মিসাইলবাহী সাবমেরিনের চার ভাগের তিন ভাগ সহ ছয়শো যুদ্ধ বিমান, ১৩তম ট্যাকটিক্যাল এয়ার ফোর্সের ফাইটার বোমারু, লং রেঞ্জ বোমারু, নেভাল স্ট্রাইক এয়ারক্র্যাফট এবং দুটো মটরাইজড্ রাইফেল ডিভিশন ও এক রেজিমেন্ট মেরিন মোতায়েন আছে ওখানে। সোয়ালবার হচ্ছে সেখান থেকে আটলান্টিকে পৌঁছার সহজ রুট।

আরেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ মারমানস্ক। সোভিয়েত বাণিজ্যিক শিপিঙের জীবনরেখা ওটা, একমাত্র বরফ-মুক্ত হারবার। সেখান থেকেও আটলান্টিকে পৌঁছার সহজ রুট সোয়ালবার। এবং সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, লংইয়ারবিয়েনে রুশরা রাডার বসাতে পারলে মার্কিন মিসাইল বা বিমান, কোনদিন রাশিয়ার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। আরেকদিকে রাশিয়ার জন্যে তা হবে উল্টো, মিসাইল রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমেরিকার দিকে আটশো মাইল এবং ইওরোপের দিকে ছয়শো মাইল এগিয়ে যাবে সে। রীতিমত অকল্পনীয় অগ্রগতি।

তাই এখানে দুটো সিস্টেম গড়ে তুলতে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। একটা লং রেঞ্জ স্ট্রাটেজিক আর্লি ওয়ার্নিং, অন্যটা লোকাল সার্ভেইল্যান্স। প্লাটা বেরগেটের রাডার হবে ছোট, লোকাল সার্ভেইল্যান্স রাডার। লং রেঞ্জ স্ট্রাটেজিক আর্লি ওয়ার্নিং রাডার বসানো হবে ইসফিওর্ডে, রেডিও স্টেশনের কাছে। দুটো মিলে হবে চমৎকার এক কম্বিনেশন।

যদি এমন হয়, হাডসন স্ট্রেইটের পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে কোন আমেরিকান বি-৫২ বা বি-১, সঙ্গে সঙ্গে ইসফিওর্ডের রাডারে তা ধরা পড়ে যাবে, লংইয়ারবিয়েন এয়ার ফিল্ডের রুশ কন্ট্রোল রুমের ভিডিওতে দশ সেকেন্ডে পাঠিয়ে দেবে সঙ্কেত।

আর যদি কোন এয়ারক্র্যাফট মিসাইল ছোঁড়ে, প্লাটা বেরগেটের ওপরের রাডার সেটাকে সনাক্ত করবে। যদি সাবসোনিক ক্রুজ মিসাইল হয়, আঘাত হানার দেড় ঘণ্টা আগে সেটাকে সনাক্ত করা যাবে, ব্যালিস্টিক মিসাইলের ক্ষেত্রে সময় পাওয়া যাবে অল্প–মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড। তবে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে সময়টা যথেষ্ট।

আমেরিকার যদি কখনও রাশিয়াকে আক্রমণ করার দুর্মতি হয়, যদি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে বসে, বা লো-ফ্লাইং বিমান পাঠায়, উত্তর আমেরিকার আকাশসীমা পেরিয়ে আসামাত্রই প্রথম রাডারে ধরা পড়ে যাবে সেগুলো।

তৎক্ষণাৎ ওটা সে তথ্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করে দেবে আরখানজেলস্কোই বা আর্চ অ্যাঞ্জেলের রুশ এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের হানিওয়েল ২০০০ ডাটা প্রসেসরে।

হাসি ফুটল কবীর চৌধুরীর মুখে–বিদ্রূপের, করুণার হাসি। আমেরিকান মিসাইল বা প্লেন ট্র্যাক করতে সাহায্য করবে আমেরিকারই তৈরি কম্পিউটার! বাহ্! ভালই।

দুপুরের পর প্লাটা বেরগেট থেকে ফিরে রিপোর্ট করল কর্নেল ম্যাকারভ। ধ্যানমগ্নের মত শুনে গেল সে। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো কর্নেল দক্ষিণের সম্ভাব্য

হুমকিটা সনাক্ত করতে পেরেছে বলে।

'ওদিকটা সামাল দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে,' মন্তব্য করল সে। 'সমস্যা যদি কখনও আসে, ওদিক থেকেই আসবে।'

'ইয়েস, স্যার!' মাথা ঝাঁকাল কর্নেল।

ফোর্ট ব্র্যাগ, নর্থ ক্যারোলিনা।

'জেন্টেলমেন, মীট ইওর টীম লীডার হিয়ার, মেজর মাসুদ রানা অ্যান্ড হিজ অ্যাসোশিয়েট, মিস্ সোহানা চৌধুরী,' বলল ডেল্টা ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা, কর্নেল চার্লস বেকউইথ। ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা লোকটা, দানবীয় স্বাস্থ্য–বুকের ছাতি ছেচল্লিশ।

১৯৭৯ সালে তেহ্‌রান থেকে মার্কিন জিম্মি মুক্ত করতে যে কমান্ডো মিশন গিয়েছিল, সেটার পরিকল্পনা ছিল এই লোকের। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কার্টার উনিশবার স্থগিত করেন মিশনের যাত্রা, তার কারণ ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অদক্ষতা। ফলে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় 'চার্লি'স অ্যাঞ্জেলস্'। তখনই পদত্যাগ করতে চেয়েছিল বেকউইথ, কিন্তু কার্টার তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। 'ব্যর্থতা তার নয়,' মন্তব্য করেছিলেন কার্টার। 'আমাদের। দেরিতে যাত্রা করতে না হলে ও ব্যর্থ হত না।'

তারপর যতগুলো কমান্ডো মিশন চালিয়েছে ডেল্টা ফোর্স, প্রত্যেকটাই সফল। অনেক ভেবেচিন্তে এদের মধ্যে থেকেই কমান্ডো বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। কয়েকশো ট্রুপার আছে ডেল্টা ফোর্সের, প্রত্যেকে ব্ল্যাক বেরেট। দৈহিক শক্তি, ক্ষমতা আর মানসিক সহ্যশক্তির ক্ষেত্রে এরা একেকজন অমানুষই বলা চলে। অফিসারদের সবাই হয় রেঞ্জারস, নয়তো এয়ারবোর্ন ট্রেইনড্, কেউ কেউ দুটোই।

ফোর্ট ব্র্যাগ যদি ইংল্যান্ডে হত, তাহলে সেটার ট্রেনিং এরিয়া ও ব্যারাক অ্যাল্ডারশট থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিস্তৃত হত–এতই বিশাল জায়গা। আর্মিদের ভাষায় ওটাকে বলা হয় 'রিয়েল এস্টেট'। দুটো ইউএস এয়ারবোর্ন ডিভিশন ও স্পেশাল ফোর্স বা গ্রীন বেরেটের ঘাঁটি ওটা। ডেল্টা পরেরটার অংশ।

একটু আগে ন্যাটোর সী কিং কপ্টারে চড়ে এখানে পৌঁছেছে রানা-সোহানা ও অ্যাডমিরাল কিং। এখন ব্যারাকের নিচু ছাদওয়ালা হলরুমে একদল ব্ল্যাক বেরেটের মুখোমুখি বসে আছে।

'মেজর,' রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল বেকউইথ। একটা নামের তালিকা তুলে দিল হাতে। 'আপনার চাহিদা অনুযায়ী বাছাই করা হয়েছে এদের। যে যার ক্ষেত্রে সেরা এরা। এদের জুড়ি খুঁজে পাবেন না আপনি।'

ওটায় নয়টা নাম আছে, সেগুলো পড়ল রানা: ক্রেইগ ক্লিফোর্ড, হাওয়ার্ড স্মিথ, ত্রেভিনস্কি, বাকহার্ড, জনসন, মিলার, নেইলসন, ওয়েসটন ও পলসেন।

প্রথম এবং শেষের তিনজন বেকউইথের মতে সাগর বিশেষজ্ঞ। উত্তর আটলান্টিক তাদের নখদর্পণে। এছাড়া নরওয়েজিয়ান ভাষার ওপর ভাল দখল আছে তাদের, ক্লিফোর্ড ছাড়া বাকি তিনজন নিজেদেরকে নরওয়েজিয়ান দাবি

করলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। ক্লিফোর্ড কাজ চালাবার মত জানে ভাষাটা।

অন্যদের মধ্যে স্মিথ (ক্যাপ্টেন) ও ত্রেভিনস্কি (কর্পো:) ডেমোলিশন এক্সপার্ট, মিলার (সার্জেন্ট) এ প্লাস শ্রেণীর স্নাইপার, বাকহার্ড (সার্জেন্ট) নেভিগেশন এক্সপার্ট, ঠেকা-বেঠেকায় মেডিকের দায়িত্বও পালন করতে পারবে, এবং জনসন (লেফটেন্যান্ট) ফার্স্ট ক্লাস মেডিক-কাম-রেডিও অপারেটর। অবশ্য ওসব নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলল না রানা।

এদের প্রত্যেকের রেকর্ড নরফোকে বসেই জানা হয়ে গেছে। অ্যাডমিরাল কিঙের অনুরোধে ফোর্ড-ব্যাগ কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিয়েছিল। একে একে প্রত্যেকের সাথে হাত মেলাল রানা। দু'এক কথায় সৌজন্য বিনিময় করল।

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড স্মিথ বলল, 'মনে হচ্ছে মিশন খুব টাফ হবে!'

'আ ভেরি টাফ ওয়ান,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'টাফার দ্য বেটার,' চোখের দুই কোণ কুঁচকে উঠল হাওয়ার্ডের। হাসছে।

তালিকার নামগুলো আরেকবার পড়ে নিয়ে একজন একজন করে কল করল রানা, স্প্রিঙের পুতুলের মত সটান দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো, এগিয়ে এসে হাত মেলাল লীডারের সাথে।

ডেল্টা ফোর্সের কম্পাউন্ডের বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তো কথাই নেই, ভেতরের ব্যবস্থাও খুবই কড়া। ট্রুপারদের কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকে না। ছবি তোলা কড়াভাবে নিষেধ। তাদের শেখানো হয়, গ্রীন বেরেটরা যে ধরনের পাবলিসিটি উপভোগ করে থাকে, তা কেবল অনাকাঙ্ক্ষিতই নয়, বিপজ্জনকও।

আজকের জন্যে আরও এক কাঠি বাড়তি সতর্কতার আয়োজন করেছে চার্লস বেকউইথ, সেটা হচ্ছে, ব্রীফিং রুমে ঢোকার আগে নতুন করে সদস্যদের আইডি চেক করা। নরফোক থেকে নিয়ে আসা ফটোগ্রাফ ও ভিউগ্রাফের সাহায্যে মিশন ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা।

'এ মিশনের কোড নেম রাখা হয়েছে ভার্জিনিয়া রিজ,' ঘোষণা করল ও। 'বলার অপেক্ষা রাখে না যে নামটাও টপ সিক্রেট। অন্তত ত্রিশ বছরের আগে পাবলিকের কানে যাওয়া চলবে না এ-নাম। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর মিশন হবে এই "ভার্জিনিয়া রিজ", দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এরকম কোন কমান্ডো মিশনে অংশ নেয়নি আমেরিকা।'

এরপর অসংখ্য ইলাস্ট্রেশনের সাহায্যে সোয়ালবারের অবস্থান, গুরুত্ব এবং আর্কিপেলাগোর স্ট্র্যাটেজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলল ও, সেই সাথে রাশিয়ানরা ওখানে কি করতে যাচ্ছে, তাও।

'যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্স ইন্টারপ্রিটেশনস্ আমরা ওই অঞ্চল থেকে পাচ্ছি,' রিমোট-কন্ট্রোল বাটন টিপে স্ক্রীনে নতুন একটা ছবি ফোটাল রানা, 'তাতে ওদের রাডার দেখতে এই ধরনের কিছু একটা হবে।'

ড্রইং বোর্ডে ছোটখাট একটা বিল্ডিং ভেসে উঠল, ওটার ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে ইয়া মোটা স্টীলের পিলার, তার ওপর বসানো আছে বিশাল রাডার স্ক্যানার। হাতে আঁকা ছবি, প্লাটা বেরগেটের অধিত্যকা, বরফ, সবই আছে ওতে।

'আমাদের লক্ষ্য হবে এই বিল্ডিং,' বলল ও। 'এখনও অবশ্য নির্মাণ হয়নি ওটা, তবে হয়ে যাবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে। ততদিনে তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাবে ওখানে, তাপমাত্রা একটু একটু বাড়তে শুরু করবে। তবে পুরো আঁধারে কাজ করার সুযোগ পাব না আমরা, আড়ালও খুব অল্পই পাব। কাজেই খুব সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। রাডার ধ্বংস করে দেয়ার পর কপ্টার গিয়ে তুলে আনবে আমাদেরকে।'

এক সময় ওর দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলো। এবার একের পর এক প্রশ্ন আসতে শুরু করল। কৌশলগত দিক, অস্ত্রশস্ত্র, রেডিও কমিউনিকেশনস্ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইল সদস্যরা, একজন একজন করে সবাইকে সন্তুষ্ট করল রানা।

'অ্যাসাইনমেন্টটা সিআইএ কে দেয়া হলো না কেন?' প্রশ্নটা করল সার্জেন্ট বাকহার্ড।

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল ও, কিন্তু লেফটেন্যান্ট জনসন তার আগেই বলে উঠল, 'ওরা অ্যাসাইনমেন্ট লেজে-গোবরে করে ফেলবে, তাই।'

হেসে উঠল অন্যরা। রানা মাথা নাড়ল। 'তা নয়। আপনাদের মত মাউন্টেইন-ওয়রফেয়ার স্কিল ওদের নেই বলে দেয়া হয়নি।'

একজন বিদেশী হয়েও রানাকে কেন এই মিশনের লীডার করা হয়েছে, সে প্রশ্ন কেউ তুলল না। কারণ চার্লস বেকউইথ আগেই সে পথ মেরে রেখেছে।

'একটা ব্যাপারে সবাই খুব ভাল করে জেনে রাখুন,' সবার শেষে বলল ও। 'এটা টপ্ সিক্রেট মিশন। আপনাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। ইট'স আ ক্ল্যান্ডেস্টাইন, রিপিট, ক্ল্যান্ডেস্টাইন অ্যাসাইনমেন্ট। আরেকটা কথা, থিওরি অনুযায়ী আমাদের মৃত্যু হলে ঘটনা প্রকাশ্যে জানাজানি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবে না। কেননা আমেরিকা এবং রাশিয়া, কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইবে না, মার যে-ই খাক, মুখ বুজে হজম করে যাবে। আর যদি আপনারা সফল হয়ে ফিরতে পারেন, তাহলেও কেউ বাহ্‌বা জানাতে আসবে না। আর্লিংটনে গান স্যালুটসহ দাফন, অথবা প্রেসিডেনশিয়াল রিসেপশন, কোনটাই জুটবে না আপনাদের ভাগ্যে।

'এখনও যদি কেউ দল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিতে চান, করতে পারেন। সে জন্যে কাউকে দোষ দেয়া হবে না, ডিজঅনারও করা হবে না। নান হোয়াটসোএভার।'

এক এক করে নয়টা পাথর মুখের দিকে তাকাল রানা, সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করল। নয় জোড়া চোখের অপলক চাউনি ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল।

'খুব শিগ্‌গিরি আবার মিলিত হব আমরা,' বলল ও। 'তখন আরও ডিটেইলস আলোচনা হবে। থ্যাঙ্ক ইউ, জেন্টেলমেন। থ্যাঙ্ক ইউ, কর্নেল।'

সাত

স্টর ফিওর্ড, নরওয়ে। আর্কটিক সার্কেলের ভেতরে জায়গাটা।

মাসুদ রানা ও SACLANT-এর দ্বিতীয় সাক্ষাতের তিনদিন পরের কথা। নরওয়েজিয়ান আর্মির স্পেশাল শাখার এক মেজর, প্যাট ডিলনের সাথে তার ফিশিং ট্রলার নর্দার্ন লাইটের হুইল হাউসে বসে কথা বলছে অসলোর ন্যাটো নর্দার্ন ইওরোপিয়ান হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশনস্ ডিরেক্টরের ভাইস-চেয়ারম্যান হ্যারি পিটারসন।

কলসাস থেকে বারডুফস কপ্টারে এসেছে লোকটা, সেখান থেকে গাড়িতে স্টর ফিওর্ড। কাঠের এক জেটিতে বাঁধা রয়েছে নর্দার্ন লাইট, একটু একটু দুলছে ঢেউয়ে।

প্রকাণ্ডদেহী মানুষ প্যাট ডিলন সাদা, ঢোলা সোয়েটারে পোলার ভল্লুকের মত লাগছে তাকে। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের মত বয়স। মুখটা বড়সড়, ফোলা। দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে ধরে আছে সে। ভাইস-চেয়ারম্যানের প্রশ্নের জবাবে মাথা দোলাল। 'খুব সম্ভব। আমি অন্তত অসম্ভবের কিছু দেখছি না।'

তবু সন্দেহ যায় না পিটারসনের, একবার ডিলনকে দেখছে, আরেকবার নর্দার্ন লাইটের ওপর নজর বোলাচ্ছে। মাঝারি উচ্চতার মানুষ সে, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গালে চাপদাড়ি, চোখে পাওয়ারওয়ালা চশমা। 'আপনার বোট দেখে কিন্তু তেমন মনে হয় না।'

ঘোঁৎ করে উঠল মেজর। 'এটা স্ট্যান্ডার্ড ফিশিং ট্রলার, ম্যান! ছয়শো কিউবিক ফুট ক্যাপাসিটির হোল্ড। ভেতরে বাঙ্ক আছে, ষোলোজন মানুষ আর তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র অনায়াসে ধরে যাবে, জানেন?'

আরেকবার বোটটাকে দেখল পিটারসন। ট্র্যাডিশনাল ফিশিং ট্রলারই নর্দার্ন লাইট। কাঠের তৈরি। বার্নিশ করা। বডির দু'দিকে বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত চার ইঞ্চি চওড়া সাদা ব্যান্ড। ওটার ভেহিকল্ নম্বর F 192 H। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ষাট ফুট লম্বা। ছয় জানালাওয়ালা সাদা রং করা হুইল হাউস। তার পিছনে একটা কেবিন। হুইল হাউসের মাথায় একটা সার্চ লাইট এবং একটা বার আকৃতির রাডার স্ক্যানারও আছে।

'পিছনের হোল্ড ফায়ারপ্রুফ, অ্যামিউনিশন স্টোরেজ ওটা,' আবার বলল পোলার ভল্লুক। 'ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, হিটার, সব আছে। আসুন, নিজের চোখেই দেখে নিন।'

নীরবে তাকে অনুসরণ করল পিটারসন, দশ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে দেখল ট্রলারটা। 'স্পীড কত?' জানতে চাইল সে।

'বেশি নয়, দশ নট্। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে এরকম অন্তত দু'হাজার ট্রলার পাবেন আপনি।'

'হুঁম!' বলল পিটারসন।

'কতজনের পার্টি?' প্রশ্ন করল মেজর ডিলন।

'সেটা এখনও ঠিক হয়নি,' চিন্তিত চেহারায় সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল ভাইস-চেয়ারম্যান। 'আশা করছি খুব শিগ্‌গিরি জানতে পারব তা।' কি খেয়াল হতে ঝট্ করে মেজরের দিকে ফিরল হঠাৎ। 'কিন্তু সাবধান! নরওয়েজিয়ান নেভিকেও কিছু টের পেতে দেয়া চলবে না। টের পেলে নিশ্চই বাধা দেবে ওরা।'

পাইপ হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখল ডিলন। এমনভাবে, যেন বদ্ধউন্মাদ একজনকে দেখছে। 'অফকোর্স!' মাথা ঝাঁকাল একটু পর। 'সবাইকে জানান দিয়ে গেলে সেটা ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশন হয় কি করে?'

'তা বটে।'

হাসি ফুটল প্রকাণ্ডদেহী নরওয়েজিয়ানের মুখে। 'শুধু আমাদের নেভি কেন, রাশিয়ান নেভিকেও চেষ্টা করলে ফাঁকি দিতে পারব আমরা।'

উঠে পড়ল ভাইস-চেয়ারম্যান। 'এবার ফিরতে হয়। যে কোনদিন যাত্রা করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। সময় হলে আপনাদের কন্ট্রোলারের নির্দেশ পৌঁছে যাবে।'

ব্রাসেলস্।

সময় যত ছুটির দিকে গড়াচ্ছে, ততই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে সান্ড্রা। বারবার ঘড়ি দেখছে, ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে জেনারেলের রুমের বন্ধ দরজার দিকে। আজ অতিরিক্ত সময় অফিস করতে হলে সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এরিকের জন্যে ডিনার তৈরি করতে হবে তাকে।

'কি হয়েছে, সান্ড্রা?' ওর অস্থিরতা দেখে প্রশ্ন না করে পারল না জুলিয়া। 'বয়ফ্রেন্ড প্রবলেম? ওদের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না, ডিয়ার। আমার পরামর্শ শোনো। বেশি পাত্তা দিয়ো না, সে যদি বেয়াড়া হয়, তাহলে তো···সরি।' অন্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে বেশি কথা বলে ফেলেছে বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়ে গেল।

'কি হয়েছে, জুলি?' ওর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে জানতে চাইল সান্ড্রা। 'আবার ঝগড়া করেছ ওর সাথে?'

'ও কিছু নয়। তুমি চিন্তা কোরো না, এক্সট্রা টাইম কাজ করতে হলে আমি করব আজ। তুমি চলে যেয়ো।'

'ধন্যবাদ, ডার্লিং।'

সেদিন সন্ধেয় একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়মতই এল এরিক ব্রাউন। মেজাজ খারাপ, মূড অফ। এসেই হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বসল, খুব দ্রুত প্রথম পেগ ভেতরে চালান করে দিল। সান্ড্রার দিকে নজর নেই। ও যে চুলের রং বদলে ফেলেছে, খেয়ালই করছে না। 'কি হয়েছে তোমার?' ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'আজ খবর পেলাম, ডের স্পিগেল সত্যি সত্যি ফিচার রাইটার খুঁজতে শুরু করেছে,' বলল এরিক। দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। 'গড ইন হেভেন। একটা অন্তত স্কুপ নিউজ চাই-ই আমার এই মুহূর্তে। অন্তত একটা, নইলে এত কষ্ট,

বিয়ের প্ল্যান-প্রোগ্রাম, সব ভেস্তে যাবে।'

'কিন্তু আমার অফিসে তো তেমন কিছু ঘটছে না, ডার্লিং।'

'কিছুই ঘটছে না?' সরাসরি ওর দিকে তাকাল জার্মান। 'কিছুই না? বাই গড! দুনিয়াটা কি থেমে আছে?'

'না, ঠিক তা নয়,' আমতা আমতা করতে লাগল সান্ড্রা। 'একটা বিষয় অবশ্য ঘটেছে···মানে ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না সে খবর জেনে তোমার কোন লাভ হবে।'

সোফায় কাত হয়ে প্রায় শুয়ে ছিল যুবক, কথাটা শুনে তিড়িং করে সিধে হয়ে বসল। 'কি, কি! কি ঘটতে যাচ্ছে?'

বলব? ভাবল সান্ড্রা, বলি? আজ সে জেনারেল অ্যান্ডারসনকে টেলিফোনে নরফোকের অ্যাডমিরাল হাওয়ার্ড কিঙের সাথে কথা বলতে শুনেছে। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে আমেরিকা ও নরওয়ে মিলে নরওয়েতে খুব শীঘ্রি যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করতে যাচ্ছে, এবং ব্রাসেলস্ সে ব্যাপারে কয়েকদিনের মধ্যে স্টেটমেন্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

কি হবে বললে? দু'দিন পর যে খবর সারা দুনিয়া জানবে, ন্যাটো নিজেই জানাবে, সে খবর দু'দিন আগে এরিক জানলে ক্ষতি কি?

খবরটা শোনামাত্র সতর্ক হয়ে উঠল যুবক। 'সত্যি নাকি? কিন্তু কিছুদিন আগেই না ওখানে ওদের একটা মহড়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। এটা বোধহয় তার ফলো-আপ্ হবে।'

বাঁকা হাসি দেখা দিল এরিকের মুখে। 'কিন্তু এত সৈন্য, সাজ-সরঞ্জাম জড় করা, এত খরচ, এসব করে লাভ কি বুঝি না। গত মহড়ার ছবি দেখেছ? সৈন্যরা খাচ্ছে, পান করছে, সান-বাথ করছে, এছাড়া আর কিছুর ছবি তো চোখে পড়েনি আমার,' শব্দ করে হাসল এবার। 'এই করে রাশিয়াকে ভয় দেখাতে চায় ওরা?'

হাসিটা পছন্দ হলো না সান্ড্রার। 'আমি ওসব জানি না। খবর একটা আসছে, তাই বললাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাই লাভ।'

বেশ নিচু দিয়ে উড়ে চলেছে একটা সী কিং হেলিকপ্টার। ওটার একজোড়া জেট এঞ্জিন আওয়াজ করছে চাপা মেঘগর্জনের মত। একটু নিচে ফুঁসছে ধূসর, ক্রুদ্ধ ব্যারেন্ট সাগর। ছোট একটা জানালা দিয়ে আবছাভাবে বাইরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ক্রু চীফ। মাঝারি তুষারপাত হচ্ছে বাইরে। আকাশে ঘন মেঘ।

ওর মধ্যেও সূর্যের দুর্বল হলদেটে আভা দেখা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। আরও উত্তরে গেলে এই আলোটুকুও থাকবে না, সেখানে কেবলই অন্ধকারের রাজত্ব। রাডারের চোখে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে পানির পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে ছুটছে সী কিং, মাঝরাতের অন্ধকারে সোয়ালবার পৌঁছবে। ভেতরের ক্যানভাস সীটে বসে আছে পাঁচ ক্রু, তাদের চীফ কেবল ফ্লাইং হেলমেট পরে আছে। ওটার মাইক্রোফোনের সাহায্যে প্রয়োজনে পাইলটের সাথে কথা বলতে পারে সে।

সজাগ, সতর্ক লোকটা। নরওয়েজিয়ান স্কিয়েগারের এক লেফটেন্যান্ট।

অন্যরাও স্কিয়েগার। সময় পার করার জন্যে বসে বসে ঝিমাচ্ছে তারা। এছাড়া করার কিছু নেইও, জেট এঞ্জিনের গর্জনে কথা বলার জো নেই, কিচ্ছু বোঝা যায় না। তাই সে চেষ্টাও নেই কারও মধ্যে, আসন্ন অ্যাকশনের চিন্তায় মগ্ন তারা। ডিফেন্স কমান্ড হেডকোয়ার্টার্সের ব্রীফিং শেষ হয়েছে যেন কয়েক যুগ আগে; ক্রু-চীফ ভাবছে। মনে হচ্ছে নরওয়ে কয়েক হাজার মাইল পিছনে পড়ে গেছে এতক্ষণে।

পাঁচ ঘণ্টার ফ্লাইট। তিন ঘণ্টার মাথায় হ্যামারফেস্ট পৌঁছে রিফুয়েলিং করিয়ে নিয়েছে সী কিং, আর অল্প পথ বাকি। গোপন এক মিশনে চলেছে স্কিয়েগার বাহিনী। কপ্টারের পিছনদিকে বেঁধে রাখা আছে রসদ–বিস্ফোরক, খাবারের প্যাকেট, সাদা ক্যামোফ্লেজ নেটিং, টেন্ট শীট এবং অস্ত্র-গুলি।

একেবারে বিনা নোটিসে কাত হয়ে গেল কপ্টার, বিচ্ছিরি আওয়াজ করে উঠল রোটর। নিশ্চয়ই রাডারে কোন জাহাজ পিক করেছে পাইলট, ক্রু চীফ ভাবল। সামলে নিয়ে বাইরে তাকাল সে, দূরে অস্পষ্টভাবে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া দেখতে পেল যেন। ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, তাই। সামনে ওটা বেয়ার আইল্যান্ড। আঁধারের রাজত্ব বাড়ছে।

সঙ্গীদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে। নড়েচড়ে বসল মানুষগুলো, প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। অনেক সামনে উজ্জ্বল একটা আলো চোখে পড়ল পাইলটের, তিনবার ফ্ল্যাশ করে নিভে গেল। সেখানটায় পৌঁছে শূন্যে থেমে পড়ল সী কিং, স্লাইডিং ডোর টেনে খুলে ফেলল ক্রু চীফ। অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল তার, মনে হলো ভুল করে কোন দৈত্যাকার আইস চেম্বারের দরজা খুলে ফেলেছে বুঝি।

ইন্টারকমের মাধ্যমে ইঞ্চি ইঞ্চি করে কপ্টারের উচ্চতা কমাতে সাহায্য করল সে, ল্যান্ড করল ওটা। পাইলট অফ করে দিল এঞ্জিন।

ভ্যান মিয়েনফিওর্ডের দুর্গম এলাকা এটা, মানুষজন থাকে না। লংইয়ারবিয়েনের পাহাড় শ্রেণী থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। ম্যাপে দূরত্ব তাই দেখানো আছে, কিন্তু যে দু'জন মালপত্র বুঝে নিতে আসছে, তাদেরকে ঘুরপথে স্কি করে আসতে-যেতে প্রায় একশো কুড়ি কিলোমিটার দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে।

রোটর ব্লেড থেমে গেছে সী কিঙের, লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, বাতাসের এলোমেলো গোঁ-গোঁ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চার দিগন্তে আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণীর ভৌতিক ছায়া। নিঃসঙ্গ একটা তারা টিপ্ টিপ্ করছে আকাশে, দুর্বল। ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস ছাড়ছে ক্রু চীফ, পারকার ফারমোড়া হুডের নিচে থুতনি এরইমধ্যে অসহ্য ঠাণ্ডায় জমে আসতে শুরু করেছে তার। দক্ষিণে একটু একটু করে আলো ফুটছে।

চারদিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট সতর্কতার সাথে, কোন অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। ভয় ভয় লাগছে। আসছে না কেন ওরা? একশো মিটার দূরে ঘরটা দেখতে পেল সে–ট্র্যাপারস' হাট। শক্তপোক্ত মজবুত কাঠের ঘর। কিন্তু পল মিডল্যান্ড কোথায়? লোকটার দেখা নেই কেন? ভাবতে না

ভাবতেই হাটের দিক থেকে নিচু শিসের শব্দ ভেসে এল। গ্লাভস দিয়ে আড়াল করে তিনবার টর্চলাইট জ্বালল লেফটেন্যান্ট, জবাবে একজোড়া মানুষের কাঠামো আলাদা হলো হাটের গা থেকে, স্কির সাহায্যে গ্লাইড করে এগিয়ে আসতে লাগল ওরা। তাদের একজন হ্যান্ডসাম মাইন সার্ভেয়র, পল মিডল্যান্ড, অন্যজন ফোরম্যান হাকুন সমারভিক। সঙ্গীর চেয়ে কম করেও চার ইঞ্চি দীর্ঘ ফোরম্যান, পাশেও তেমনি। গালে কুঠার আকৃতির চাপদাড়ি।

আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ। 'পুল্‌ক্‌' নামের এক ধরনের সমতল স্লেজে করে সঙ্গে করে আনা মালপত্র ট্র্যাপারস' হাটে পৌঁছে দিল স্কিয়েগাররা। ভেতরে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করে বড়সড় একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে পল ও হাকুন, সব তার মধ্যে রেখে বরফ দিয়ে আবার ঢেকে ফেলা হলো সেটা।

বন্ধ দরজার বাইরে প্রায় কোমর সমান উঁচু হয়ে ছিল তুষার, দরজা ঠেলে দিয়ে বেলচার সাহায্যে আবার সেইরকম করে সাজানো হলো। দূর থেকে দেখে যখন মনে হলো নিখুঁত হয়েছে কাজটা, তখন ক্ষ্যান্ত দিল সবাই। পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে কপ্টারের কাছে চলে এল সবাই। মিনিট দুয়েক কথা হলো মেজর ও লেফটেন্যান্টের মধ্যে। বিদেয় নেয়ার আগে সিনিয়রকে স্যালুট করল জুনিয়র। 'বেস্ট অভ লাক, স্যার।'

একটু পর উঠে পড়ল সী কিং, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। চারদিকে নজর বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেজর পল মিডল্যান্ড। অসলোর নির্দেশে এখানে এসেছিল তারা, জিনিসপত্র বুঝে নিতে। এসব কেন পাঠানো হয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানায়নি অসলো, জানাবার মত সুযোগও নেই। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না–এর কারণ একটাই, রুশ রাডার ধ্বংস করতে কমান্ডো বাহিনী আসছে।

ওগুলো রিসিভ করার নির্দেশ পেয়ে গতকাল একটা হালকা প্লেন নিয়ে ভ্যান মিয়েনফিওর্ডেরই এক মাইনিং সেটলমেন্ট সভিয়াগ্রুভায় এসেছে সে ও হাকুন, সার্ভে করতে যাচ্ছে বলে। সেখান থেকে স্কিডূ চড়ে এখানে এসেছে সম্ভাব্য 'নতুন মাইনের' খোঁজে।

'চলো,' সঙ্গীর উদ্দেশে বলল পল। 'দুনিয়ায় ফিরে যাই।'

স্কিডূতে চড়ে রওনা হলো দুজনে। মিডল্যান্ড ড্রাইভ করছে। ভিশন নিয়ে হলো সমস্যা। ফিওর্ডের উপকূল ধরে যতক্ষণ চলছিল, ভালই দেখা যাচ্ছিল, তারপরই সমস্যায় পড়ল সে। রেইনডালেন নামে এক উপত্যকায় এসে পড়ল ডূ। ওটা পেরোতেই তেরোশো ফুট উঁচু এক পাস। সূর্যের অদৃশ্য আলোয় সামনের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। কোথায় খাড়া ঢাল, কোথায় কি, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভিজিবিলিটি পঞ্চাশ গজ থেকে ঝপ্‌ করে পনেরোয় নেমে এসেছে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল মিডল্যান্ড।

ডূ থামাল, পকেট থেকে আল্টিমিটার বের করে দেখল। সী লেভেলের একত্রিশ মিটার ওপরে আছে তারা।

'কেমন বুঝছেন?' প্রশ্ন করল হাকুন।

'সুবিধের না। এই অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে না। নামো, তাঁবু আর শাবল বের করো।'

তাঁবুর দড়ি টান্ করে বাঁধার সময় হঠাৎ করে হাত থেমে গেল সার্জেন্ট হাকুনের। বিপদ! কিছু দেখেনি, আন্দাজ করেছে কেবল। 'শুনছেন!' ফিস্‌ফিস্ করে বলল। 'কে যেন…!'

শক্ত হয়ে গেল মিডল্যান্ড, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। খুব কাছেই ভোঁশ ভোঁশ করে নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ, অথচ কিছু দেখা যাচ্ছে না। এগিয়ে আসছে শব্দটা।

'ভল্লুক!' হাঁকুন বলল নিচু কণ্ঠে। এবারও স্রেফ আন্দাজে বলল সে।

হোঁচট খেতে খেতে ডূর কাছে পৌঁছল মিডল্যান্ড, রাইফেল দুটো এক ঝটকায় তুলে নিয়ে একটা সঙ্গীর হাতে দিল। ব্যস্ত হাতে ব্রীচে কার্ট্রিজ ভরে প্রস্তুত হয়ে নিল দু'জনে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'বাঁ দিকে!'

ঝট্ করে ঘুরল মিডল্যান্ড। কুয়াশার মধ্যে থেকে কালো নাকওয়ালা একটা গোল, প্রকাণ্ড মাথা বের হতে দেখল প্রথমে, ডানে-বাঁয়ে দুলছে। পিছনে বিশাল দেহ। কয়েক পা এসে থেমে পড়ল ওটা, নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকতে লাগল।

'গুলি কোরো না,' মিডল্যান্ড বলল। 'আক্রমণ না-ও করতে পারে।' কাঁধে রাইফেলের বাঁট ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে বিস্ফারিত চোখে। প্রকাণ্ড এক দানব ওটা। ওজন কম করেও আধটন হবে, অনুমান করল সে। খেপে গেলে মুহূর্তে ওদেরকে খতম করে দিতে পারে জন্তুটা, চুরমার করে দিতে পারে স্কিডূ। ধারেকাছে যদি ওটার সঙ্গী থাকে, তাহলে তো সাড়ে-সর্বনাশ।

ওটার কুঁতকুঁতে দুই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে আর হাকুন। তাদেরকেই দেখছে ওটা, নাক ঘন ঘন কুঞ্চিত হচ্ছে। আশা জাগল হয়তো চলেই যাবে, কিছু বলবে না। কিন্তু ভুল, হঠাৎ করে গরগর ডাক ছেড়ে বুলডোজারের মত ছুটে এল মাথা নিচু করে। কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল মিডল্যান্ড, মুহূর্তের জন্যে গতি ব্যাহত হলো ওটার, ভয়াবহ এক হুঙ্কার ছেড়ে আবার লাফ দিল। ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল মিডল্যান্ডের, অনেক কষ্টে নিজেকে খাড়া রেখে আবার গুলি করল। একইসঙ্গে গুলি করল হাকুনও।

ফের বাধা পেল বুলডোজার, এবার এক হাঁটুতে ভর করে বসে গুলি করল মিডল্যান্ড, হাকুন করল দুটো। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল জন্তুটা, কাত হয়ে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মিডল্যান্ড। বুঝল মরে গেছে ওটা। হাকুনের শেষ গুলিটা লেগেছে ওটার মেরুদণ্ডে, ঘাড়ের একটু নিচে। সেটাই স্তব্ধ করে দিয়েছে দানবটাকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

অনেক কষ্টে ওটার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তিন ঘণ্টা পর অ্যাডভেন্টডালেনের দিকে যাত্রা করল তারা। ততক্ষণে ভিজিবিলিটি বেড়েছে আবার, মোটামুটি চল্লিশ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। জায়গামত পৌঁছতে তা আরও বাড়ল। অ্যাডভেন্টডালেনের গোড়া থেকে যে রাস্তা লংইয়ারবিয়েনের দিকে চলে গেছে, সেখানে পৌঁছে বিনকিউলারে চোখ রেখে সামনে তাকাল মিডল্যান্ড। হাসল মৃদু।

'বেশ, বেশ। দুটো রুশ ভল্লুক দেখতে পাচ্ছি ওখানে। দেখা যাক, নরওয়েজিয়ান ভল্লুকের ব্যাপারে ওদের কি মত।'

লোক দুটোর কাছে এসে স্কিড় থেকে নামল সে। মূকাভিনয়ের সাহায্যে তাদের বোঝাল, সার্ভের কাজে সভিয়া গিয়েছিল তারা দু'জন, আসার পথে এই ব্যাটা আক্রমণ করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের কাগজ পত্র চেক করে সন্তুষ্ট হলো গার্ড দু'জন, ছেড়ে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভুলল না তারা। সেখান থেকে খবর চলে গেল এয়ারফিল্ডের রুশ কন্ট্রোল রুমে।

খবরটাকে সহজভাবে নিল না কবীর চৌধুরী।

একদিন পর। লংইয়ারবিয়েন।

নিজের কন্ট্রোল টাওয়ার অফিসে মস্কো থেকে আসা এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের রাডার বিশেষজ্ঞ ইগর ইভানোভিচের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত কর্নেল ম্যাকারভ। তার সামনে হাতে আঁকা একগাদা স্কেচ, একটা একটা করে সেগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে। একটা-দুটো কথা বিনিময় হচ্ছে দুজনের মধ্যে।

'ঘর তৈরির কাজ প্রায় শেষ,' হঠাৎ মুখ তুলল কর্নেল। 'কাজটা হয়ে গেলেই শুরু করে দিতে হবে, কমরেড ইগর।'

শ্রাগ করল বিশেষজ্ঞ। খুবই ছোটখাট মানুষ, মাঝবয়সী। চোখে পুরু চশমা। 'আমার কোনও আপত্তি নেই, কমরেড পলকভনিক,' বলল সে। 'কিন্তু এত বাতাসে ওগুলো ওপরে তোলা গেলেও আসল কাজ সারা যাবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'আমি জানি না মনে করেছেন? জানি। মস্কোকে সে কথা জানিয়েওছিলাম। কিন্তু আমাদের কমরেড কন্ট্রোলার বললেন, ওরা আর সময় দিতে রাজি নয়।'

আবার শ্রাগ করল বিশেষজ্ঞ। 'তাহলে কি আর করা। ওরা যদি...'

দরজায় সজোরে নকের আওয়াজ হতে থেমে গেল সে। 'কাম ইন,' দরজার দিকে তাকিয়ে বলল কর্নেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল তার সহকারী, ক্যাপ্টেন পাপুকিন। হাতে এক টুকরো কাগজ। চেহারা উত্তেজিত।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল ম্যাকারভ।

'কমরেড পলকভনিক, ভ্যান মিয়েনফিওর্ডে একটা পরিত্যক্ত ট্র্যাপারস' হাট খুঁজে পাওয়া গেছে! মিলিটারি অ্যাকটিভিটির চিহ্ন পাওয়া গেছে সেখানে।'

সটান উঠে দাঁড়াল ম্যাকারভ, ব্যস্ত পায়ে দেয়ালে ঝোলানো বড় এক ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়াল। 'জায়গাটার রেফারেন্স?'

কাগজের টুকরোটা তার হাতে তুলে দিল ক্যাপ্টেন, দাঁড়িয়ে থাকল অ্যাটেনশন হয়ে। বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে।

'হুঁম!' কাগজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'চারজন লোক পাঠাও ওখানে। এখনই।'

ক্যাপ্টেনকে বিদেয় করে চেয়ারে এসে বসল সে। ছেদ পড়া আলোচনা শুরু করতে চাইল, কিন্তু হলো না। মন আর চোখ, দুটোই ঘুরেফিরে ম্যাপের দিকে চলে যাচ্ছে বারবার। কারা গিয়েছিল ওখানে? ভাবছে সে। নাকি এসেছিল? কারা! কেন?

'নিশ্চই!' ভাবনাচিন্তা না করেই বলে বসল ফ্রেডারিক ফলভিক, 'নিশ্চই করব! দেশের জন্যে মরতে একটুও ভয় পাব না আমি।'

'আরও ভেবে বলুন,' বলল পল মিডল্যান্ড। 'নরওয়েতে ক্ল্যাডেস্টাইন রেডিও মেসেজ পাঠাতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারেন আপনি, ওরা আপনাকে গুলি করে...'

সার্ভেয়ারের পরের কথাগুলো কানেই গেল না তার। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। মেসেজ ট্রান্সমিট করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সে, স্পাইঙের অভিযোগে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তার। মা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে, প্রিস্ট দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে, তুলোর মত নরম তুষার পড়ছে তাদের গায়ে-মাথায়। লোকটার অধৈর্য কণ্ঠের প্রশ্নে স্বপ্নভঙ্গ হলো তার।

'কি ভাবছেন?'

'কিচ্ছু না। আমি...' গলা খাঁকারি দিল সে। 'আমি রাজি।' একটু পর বলল, 'ওরা সবকিছু মিলিটারাইজ করে নিলে আমাদের চাকরি নিশ্চই থাকবে না?'

'সে তো পরের কথা,' মিডল্যান্ড বলল। 'কিন্তু আপনি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। যদি আপনি এ কাজ করতে না চান, কেউ দোষ দেবে না।'

'ভেবেছি। আমি রাজি। কিন্তু রেডিওটা কোথায় রাখা যায় বলুন তো? আমার...'

'ওটা আপাতত অ্যানির কাছেই থাকবে।'

'জিনিসটা কি ভাবে কাজ করে জানা দরকার আমার,' ফলভিক বলল। 'ওর কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'সময় হলে সে ব্যবস্থা করা হবে,' মিডল্যান্ড বলল। 'এখন না। আপনি এয়ারফিল্ডে যা যা ঘটে, বিশেষ করে রাডার ইন্সটলেশনের অগ্রগতির খবর অ্যানিকে জানাতে থাকুন। মেসেজ লিখে আগে থেকে ঠিক করা কোন জায়গায় রেখে আসতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

মাথা নাড়ল ফলভিক। 'সেটা ঠিক হবে না। আমি তো এমনিতেই অ্যানির বাসায় যাওয়া-আসা করি, সবাই জানে। খবর কিছু থাকলে গিয়ে জানিয়ে আসব।'

পরদিন দুপুরে ডিউটিতে এল ফলভিক। কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে তার নরওয়েজিয়ান সহকারীর দিকে তাকাল। 'নতুন কোন খবর?'

'দুটো সোভিয়েত কপ্টার উড়েছে,' বলল সে। 'কোথায় গেছে জানানো হয়নি আমাকে।'

ম্যাকারভের সহকারী ক্যাপটেন পাপুকিন কাছেই ছিল, কথাটা শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমাদের কপ্টার কোথায় গেল না গেল, তা নিয়ে ভাবতে হবে না, আপনাদের কাজ কেবল কমার্শিয়াল ট্রাফিকের খবর রাখা।'

'সমস্ত ফ্লাইট সম্পর্কেই জানা থাকা দরকার আমাদের,' প্রতিবাদের সুরে বলল ফলভিক।

'বলেছি তো, আমাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না,' ঘোষণা করল ক্যাপ্টেন। 'নিজেদের চরকায় তেল দিন।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসার, কিন্তু সহকারীকে দ্রুত চোখ টিপতে দেখে থেমে গেল। বুঝতে পেরেছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। দায়িত্ব গ্রহণের কাজ সেরে কফি বানাল সে, এক কাপ রুশ ক্যাপ্টেনকে দিতে ভুলল না। ভেবেছিল এতে হয়তো কৃতজ্ঞ হবে ব্যাটা, মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু হলো না। কফি খেয়ে ধন্যবাদ একটা জানাল বটে, তবে ফলভিকের মনে হলো ওর চেয়ে কুকুরের খ্যাঁকানিও অনেক মিষ্টি।

বিকেলের দিকে একটা এমআই-সিক্স হেলিকপ্টার আচমকা মেঘ ফুঁড়ে নেমে এল। এয়ার ফিল্ডে ল্যান্ড করতে বিশজন সশস্ত্র পুলিস বের হলো ওটা থেকে। প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারল না ফলভিক। ম্যাকারভের সহকারী টাওয়ারের লম্বা জানালার কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখে মৃদু হাসি।

কপ্টার থেকে নেমে আসা এক পুলিস অফিসারের ওপর চোখ পড়ল ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিসারের। সাদা ক্যামোফ্লেজ সুট পরে আছে লোকটা, কাঁধে ঝুলছে সাব-মেশিনগান। মুখ তুলে হাসল লোকটা, হাত নাড়ল ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে। তারপর বুড়ো আঙুল তুলে 'ওকে' বোঝাল।

ব্যাপার টের পেতে বেশ সময় লাগল ফলভিকের। যখন পেল, রীতিমত চমকেই উঠল–সাদা ড্রেস পরে ছিল কেন ব্যাটারা? ভাবল সে, ওটা তো সোভিয়েত বর্ডার পুলিসের ইউনিফর্ম নয়! তারা পরে ল্যাপেলে ট্যাবওয়ালা লম্বা গ্রেটকোট, মাথায় দেয় পীকড্ হ্যাট। তাহলে এরা কারা? সাদা ক্যামোফ্লেজড্ ড্রেস···স্নো ফাইটিং কিট···

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝে ফেলল সে ব্যাপারটা। ওরা পাহাড়ে গিয়েছিল টহল দিতে। কেন? হঠাৎ পাহাড়ে টহল দিতে যাওয়া কেন? কিছু সন্দেহ করেছে? কি? অফিসারটা 'ওকে' দেখিয়েছিল ম্যাকারভের সহকারীকে, তার মানে কি কাজ হয়ে গেছে? কি কাজ?

বাকি সময়টুকু অনেক কষ্টে পার করল ফলভিক, অফিস থেকে বেরিয়ে প্রায় জোর করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল। ঘণ্টা খানেক কি করে যে কাটল, নিজেও জানে না। ডিনারের খানিক আগে অ্যানির অ্যাপার্টমেন্টে এল সে।

'এরা দু'জন স্পাই,' কবীর চৌধুরী বলল। 'সরাসরি সভিয়া থেকে আসেনি। সার্ভে করতে যাওয়ার কথাটা মিথ্যে। ওরা, আপনি, সবাই মিথ্যে বলছেন,' কনফারেন্স টেবিলে দুম্ করে কিল মেরে বসল।

টেবিলের ওপাশে স্থির হয়ে বসে আছেন গভর্নর প্রিবেনসন। বাইরের প্যাসেজে মিডল্যান্ড ও হাকুন হাতকড়া পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। চারজন রুশ পুলিস রয়েছে তাদের পাহারায়। পাহাড়ের ওপর ট্র্যাপারস্' হাট খুঁজে পাওয়ার পরপরই গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে।

'আমি আপনার এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন গভর্নর। 'এ বক্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত।' একদৃষ্টে কবীর

চৌধুরীকে দেখছেন তিনি, মেজাজ সামলে রাখতে কষ্ট হলেও বুঝতে দিচ্ছেন না। অসলোর নির্দেশ আছে, যে কোন মূল্যে উত্তেজনা পরিহার করতে হবে। 'ওরা দু'জন আমার দেশের নাগরিক, আমি এখানকার গভর্নর। আমি বলছি, ওরা নির্দোষ। আপনি কোন নির্দোষ নাগরিককে গ্রেফতার করতে পারেন না।'

চুপ করে থাকল কবীর চৌধুরী। বুঝে ফেলেছে ধমক-ধামকে কাজ হবে না, তাতে বরং পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে। তাই পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কাল আপনাদের মাইন শ্রমিক নিয়ে প্লেন আসছে, ওটায় করে লোক দুটোকে পাঠিয়ে দিতে পারেন সোয়ালবারের বাইরে। অবশ্য স্পাইদের গুলি করে মেরে ফেলাই রীতি।'

'আমার দেশে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই নির্দোষ,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন গভর্নর। 'পল মিডল্যান্ড আর হাকুনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ওরা ভাল মানুষ, নিরীহ। আপনার মুখের কথায় আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারি না।' মিথ্যে বলেননি প্রিবেনসেন, ওদের দু'জনের ডবল রোলের কথা ভালই জানেন তিনি।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর। ছোটখাট মানুষটা এতখানি মানসিক বল কোত্থেকে পেল ভেবে পাচ্ছে না। 'এটাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আপনার ইচ্ছেকৃত উসকানি বলে ধরে নিচ্ছি আমি।'

শ্রাগ করলেন প্রিবেনসেন। 'আমার সরকারের ওপর আপনার যখন কোন আস্থাই নেই, তখন যা ইচ্ছে ধরে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি এই বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি দেখি না।'

মানুষটা ওঠার উদ্যোগ নিচ্ছে দেখে নরম হলো কবীর চৌধুরী। তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি তাহলে বলছেন ওদেরকে ছেড়ে দিতে?'

'অবশ্যই!'

অনেক চিন্তাভাবনা করে পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে। ঠিক করল, এর শোধ অন্যভাবে নেবে, সময় হোক।

কিন্তু প্রথম পরাজয়ের স্বাদ বড় তিক্ত লাগল তার।

হাই সিয়েরা।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে মেঘ, মাঝেমধ্যে তার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরের অন্যসব পাহাড়ের চূড়ো দেখা যায়। নিচের দিকের ঢাল ছেয়ে আছে ফার গাছে, বরফে ওগুলোর দীর্ঘ ছায়া।

মার্চের শেষ আর এপ্রিলের শুরুর সময়টা হচ্ছে হাই সিয়েরার স্কিইং সীজনের অফিশিয়াল সমাপ্তির সময়। এ সময়ে স্থানীয় রিযর্টগুলোর বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য মাসুদ রানার 'ভার্জিনিয়া রিজ' টীম এখানকার যে অংশে প্র্যাকটিস করছে, তার ধারেকাছে কোন রিযর্ট নেই। ক্যালিফোর্নিয়া ও নেভাডার বর্ডারে জায়গাটা।

গত তিনদিন থেকে দৈনিক ষোলো ঘণ্টা করে প্র্যাকটিস চলছে। নয় হাজার ফুট উঁচু এক রিজ এবং তার নিচের মালভূমি মিলিয়ে বিশাল এক ক্রস-কান্ট্রি রুট

স্কি-এ চড়ে চষে বেড়াচ্ছে দলটা। অনুসন্ধিৎসু নজর এড়িয়ে চলা যাবে বলে জায়গাটা বেছে নিয়েছে রানা। এখন প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ওদের দলটা। অবশ্য লাইভ অ্যামিউনিশন ব্যবহার করছে না ওরা।

এই রিজ আর মালভূমি লংইয়ারবিয়েনের প্লাটা বেরগেটের মত নয়, তবে একটা ব্যাপারে দুই জায়গার মিল আছে–দুটোতেই আছে বরফের খোলামেলা মাঠ এবং আড়ালের অভাব। তাছাড়া রুশদের প্লাটা বেরগেট রাডার ইন্সটলেশনের মত একটা ঘর এখানেও দাঁড় করানো হয়েছে, একদম খোলামেলা জায়গায়। অলক্ষে এগোবার উপায় নেই।

রানা রয়েছে ঘরের ভেতরে, সোহানা ও পাঁচ কমান্ডো বাইরে। নতুন আক্রমণের পাঁয়তারা কষছে। ক্লিফোর্ড, নেইলসন, ওয়েসটন আর পলসেন নেই দলে। তাদেরকে রহস্যজনক কারণে মহড়ার বাইরে রাখা হয়েছে।

এক সময় শেষ হলো অ্যাসল্ট, কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। প্রায় সবাই আগেভাগে ধরা পড়ে গেছে রানার চোখে।

'চুরি করতে এসে এতবার ধরা পড়লে আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়, স্যার,' লেফটেন্যান্ট জনসন বলল। পাঁচ ফুট আটের মত দীর্ঘ সে, বয়স চব্বিশ। মুখটা গোল, শিশুসুলভ চেহারা। 'আর কোন উপায় খুঁজে বের করা গেলে ভাল হবে মনে হয়।'

মিথ্যে নয় কথাটা, রানা ভাবল, এই সমস্যার সুরাহা করা যাচ্ছে না। প্রতিবারই ধরা পড়ে যাচ্ছে কমান্ডোরা।

'লিফটিঙের সময় কপ্টার ব্যবহার করা গেলে ড্রপিংও হয়তো সম্ভব,' বলল যুবক।

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম,' রানা বলল। 'কিন্তু পরে বাতিল করে দিয়েছি আইডিয়াটা। ওদের পুরো নর্দার্ন ফ্লীট এখন আটলান্টিকে, ধরা পড়ে যাবে অ্যাপ্রোচ।'

'সবচেয়ে ভাল হয় যদি সময়মত ওয়েদার খারাপ থাকে ওখানকার,' সোহানা বলল। পারকা আর ওভারহোয়াইট আর্কটিক ক্লোদিঙে দ্বিগুণ মোটা দেখাচ্ছে ওকে। তার ওপর রয়েছে কটন ক্যামোফ্লেজ সুট। দলের সবাই তাই পরে আছে।

'ঠিক,' রানা মাথা নাড়ল। 'কিন্তু তা না-ও হতে পারে, তাই অন্য এক আইডিয়া নাড়াচাড়া করছি আমি।'

'কি?' হাওয়ার্ড স্মিথ প্রশ্ন করল।

'মিসাইল।'

বিস্ময় ফুটল সবার চেহারায়। 'মিসাইল?' বলল সোহানা।

'হ্যাঁ। যেমন আশঙ্কা করা হচ্ছে; ওখানকার রাডার ইন্সটলেশন যদি তত বড় হয়, তাহলে ডেমোলিশন চার্জ বসাতে হবে তোমাকে। এবং সে জন্যে আগে প্রয়োজন হবে "ভেতরে পৌঁছানো," ক্লীয়ার? গত তিনদিনের প্র্যাকটিসে যা বোঝা গেল, তাতে মনে হচ্ছে সেটা হওয়ার নয়। প্রথম মারটা মিসাইল দিয়ে হলেই ভাল হবে। তারপর...'

'গুড আইডিয়া, স্যার!' প্রায় লাফিয়ে উঠল কর্পোরাল ত্রেভিনস্কি। লোকটা

পোলিশ, ডেমোলিশন এক্সপার্ট। 'কি মিসাইলের কথা ভেবেছেন?'

'সবে ভাবতে শুরু করেছি,' বলল ও। 'এখনও ঠিক করিনি।'

'টিওডব্লিউ হলে কেমন হয়, বস্?' ক্যাপ্টেন স্মিথ বলল। 'ওয়্যার গাইডেড অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল, রেঞ্জ তিন হাজার মিটার। এর আরেকটা প্লাস-পয়েন্ট হচ্ছে গাইডেন্স সিস্টেম, ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে মিসাইলকে, মিস হওয়ার কোন চান্স নেই।'

ওদের মিশনের জন্যে খুবই উপযুক্ত টিওডব্লিউ, রানা জানে। নেয়া গেলে ভাল হত, কিন্তু ওজনের কারণে তা সম্ভব নয়। লঞ্চারের পার্ট বাই পার্ট খুলে একেকজন একেকটা বয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তারপরও মিসাইল রাউন্ডের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ওগুলো ছাড়া এমনিতেও সদস্যদের প্রত্যেককে কম করেও সত্তর-আশি পাউন্ড ওজনের জিনিসপত্র বহন করতে হবে। ব্যক্তিগত অস্ত্র, চারদিনের রেশন, একটা করে টেন্ট শীট, স্টোভের জন্যে জ্বালানি তেলের বোতল, মোমবাতি, ব্যাটারি, পনেরো মিটার দীর্ঘ লাইন, আশি রাউন্ড করে গুলি, স্নো শু, ওয়াশিং কিট, বাড়তি মোজা, বাড়তি স্পেশাল মেশ আন্ডারওয়্যার। এর কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না। আবার এতকিছুর ওপর বাড়তি ওজন নেয়াও সমস্যা।

রানার চেহারা দেখে ক্যাপ্টেন বুঝল প্রথমটা চলবে না। 'ড্রাগন কেমন হয়?' নতুন প্রস্তাব দিল।

'মাত্র এক হাজার মিটার রেঞ্জ, স্যার!' ত্রেভিনস্কি আপত্তি জানাল।

'তবু রাইফেল রেঞ্জের বাইরে থেকে ছোঁড়া যাবে,' বলল সে। 'আর ওজনেও অনেক হাল্কা।'

মাথা দোলাল রানা। 'এ নিয়ে পরে কথা হবে। এখন থাক।'

দিনের শেষ অ্যাসল্ট মহড়াও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো। সে সময়ই প্রত্যেককে ক্লান্ত দেখেছে রানা, খুব ধীর ছিল ওরা। এখন আরও ক্লান্ত লাগছে। স্কি স্টিকের ওপর ভর দিয়ে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, উপায় থাকলে বোধহয় শুয়েই পড়ত। মনে মনে মিসাইল ব্যবহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। এভাবে হবে না বুঝে ফেলেছে। শুধু শুধু কষ্ট দেয়া হচ্ছে মানুষগুলোকে, কাজের কাজ হচ্ছে না কিছু। খোলামেলা জায়গায় আছে রুশ রাডার, রানা যেমন এখানে নকল রাডারের পাহারায় ছিল, তেমনি ওখানেও অবশ্যই গার্ড থাকবে। আরও বেশি সতর্ক থাকবে তারা। কাজেই এই পণ্ডশ্রমের কোন মানে হয় না।

'এভাবে হবে না,' ঘোষণা করল ও। 'কাল থেকে মিসাইল নিয়ে মহড়া হবে।'

'কি মিসাইল, স্যার?' প্রশ্ন করল বাকহার্ড।

'আমাদের জন্যে ড্রাগনই উপযুক্ত হবে।'

স্মিথ মাথা দোলাল। 'আমারও তাই মনে হয়।'

সবার ওপর চোখ বোলাল রানা। দল ছোট হতে পারে, কিন্তু যে ক'জন আছে, তারা দুনিয়ার সেরা কমান্ডোদের পর্যায়ে পড়ে। কোন কনভেনশনাল ইনফ্যান্ট্রি অথবা মেরিন অফিসার টীমের তুলনায় খুবই ছোট হয়ে গেছে দলটা,

কেননা ওসব দলে মানুষ থাকে কম করেও চল্লিশ।

কিন্তু সে জন্যে সমস্যাও হয় বেশি। শব্দ হয় বেশি, ট্রেইল চাপা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে, আবর্জনা সৃষ্টি হয়, সদস্য সবাই আছে কিনা বার বার চেক করতে হয়, মোট কথা সমস্যার অন্ত থাকে না। কিন্তু এই ক'জন নিয়ে গেলে তেমন কিছু হওয়ার জো নেই। এসব ভেবেই দল ছোট রেখেছে রানা। যদি একবার জায়গামত পৌঁছানো যায়, তাহলে সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে। সীমিত নির্দেশ এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে সর্বোচ্চ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারবে এরা।

তারওপর এদের প্রত্যেকে দুটো করে স্কিলের অধিকারী। যেমন জনসন–একদিকে রেডিও অপারেটর, অন্যদিকে মেডিক।

দলের সবার পরনে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড আর্কটিক পোশাক। তার ওপর আছে কটন ক্যামোফ্লেজ সুট। 'ওভারহোয়াইট' বলা হয় একে, কিন্তু তিনদিনের মহড়ায় ওগুলো এখন আর দর্শনযোগ্য নেই। নোংরা হয়ে গেছে, কারও কারও ড্রেস ছিঁড়েও গেছে। লুকিয়ে রাখা ব্যাকপ্যাক আর ইকুইপমেন্ট বেরিয়ে পড়েছে।

ওয়েবিং ওয়ার বেল্টের গায়ে সাদা টেপের মাস্ক রয়েছে জায়গায় জায়গায়। তবে কিছু কিছু জিনিসের রং গাঢ়, যেমন এন-ট্রেঞ্চিং টূলস্। প্রত্যেকের কিটের সাথে রয়েছে থার্মোস ফ্লাস্ক, পানি বহনের জন্যে। সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পানি নিলে তা ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবে বলে এই ব্যবস্থা। ওয়েব গিয়ারের সাথে টেপ দিয়ে জোড়া আছে ফ্লাস্ক।

হেলমেট নেই কারও মাথায়। এ মিশনে তার দরকারও হবে না, কারণ বরফের রাজ্যে উড়ন্ত শ্রাপনেলের ভয় খুব কম থাকে। তার বদলে পারকার লাইনড্ হূডের নিচে উলের নিটেড ক্যাপ পরে আছে সবাই। গলায় উলের ব্যানডানা। এদের অস্ত্র স্ট্যান্ডার্ড নয়, যেমন ত্রেভিনস্কি ব্যবহার করছে টেলিস্কোপিক সাইটওয়ালা উন্নত সংস্করণের এম-সিক্সটিন রাইফেল। যে যার পছন্দমত রাইফেল বেছে নিয়েছে। কাজের সময় যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সেজন্যে এ বিষয়ে বাধ্যতামূলক কিছু করেনি মাসুদ রানা।

হাওয়ার্ড স্মিথ আর প্রেসিডেন্ট কেনেডির মধ্যে চেহারার কোন অমিল খুঁজে পায়নি ও। কেনেডির ডুপ্লিকেট সে, বয়স ত্রিশ। ঈস্ট কোস্টের গ্র্যাজুয়েট। ভাল ফুটবল খেলে। প্রতিদিন দু'বার করে শেভ করার অভ্যেস তার। বয়সে সবার ছোট বাকহার্ড। উইসকনসিনের এক কৃষকের ছেলে সে। রেডিওম্যান। হালকা-পাতলা। একুশ কি বাইশ হবে বয়স।

ত্রেভিনস্কি খুবই হ্যান্ডসাম, লেডিকিলার মার্কা চেহারা। কুচকুচে কালো চুল তার। বয়স ত্রিশ। মিলার গোবেচারা টাইপের। নিরীহ। উচ্চতা মাঝারি, গাট্টাগোট্টা।

'আগামী কয়েকদিন আমি তোমাদের সাথে থাকছি না,' বলল রানা। 'আমার অনুপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড স্মিথ ফিল্ড প্র্যাকটিস পরিচালনা করবে।'

বিস্ময় ফুটল সবার চেহারায়। 'আপনি থাকছেন না!' বলল স্মিথ। 'কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'পারো,' তৎক্ষণাৎ বলল রানা। 'তবে জবাব পাবে না।'

হো-হো করে হেসে উঠল বাকহার্ড, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মুখে ছিপি আঁটল রানাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে। 'সরি।'

নরওয়ে যাচ্ছে রানা–ক্লিফোর্ড, নেলসন, ওয়েসটন আর পলসেনকে নিয়ে। তাদের কাজ ওখান থেকে শুরু হবে, তা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে যাবে। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে সে ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় না। যাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ও, তারা নিজেরাও জানে না সে কিছু।

'বাকহার্ড,' বলল রানা। 'কল দ্য 'কপ্টার!'

দল ভেঙে যেতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'তুমি একাই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ও।

'তুমি চাইলে আমিও...'

'দুঃখিত, সোহানা,' দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'একদিনও ফিল্ড প্র্যাকটিস মিস করা চলবে না।'

আট

'নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিল আজ ব্রাসেলসে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হয়েছে। মন্ত্রীরা সংস্থার ওপর নিজ নিজ দেশের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে আশা প্রকাশ করেছেন যে জাতিসংঘের একান্ন নম্বর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি ও...' বিবৃতি থেকে চোখ তুলে হাসল এরিক ব্রাউন।

শেষ প্যারায় নজর দিল। 'সোয়ালবারে রুশ নগ্ন হস্তক্ষেপের ফলে সে অঞ্চলে যে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবিলার জন্যে উত্তর আটলান্টিকে মোতায়েন ন্যাটোর নৌ-বহর সদাসতর্ক থাকবে...'

আবার চোখ তুলল সে। এ মুহূর্তে ন্যাটো সদর দফতরের প্রেস সেন্টার কনফোর্সে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে ন্যাটোর সর্বশেষ যুক্ত বিবৃতি। বাঁ দিকের শেষ প্রান্তে একটা ক্যান্টিন আছে, বাকিটা ওখানে বসে পড়বে বলে পা বাড়িয়েছিল, এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সান্ড্রার সহকর্মী জুলিয়ার সাথে।

'হ্যাল্লো!' উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল মেয়েটা। 'আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের!' সরাসরি এরিকের চোখে চোখ রেখে বলল, মুখে উসকানির হাসি।

'হাই!' পাল্টা হাসল যুবক। আগে একবারই এর সাথে দেখা হয়েছে তার, সান্ড্রা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটাকে খুব ধনী লোকের রখে যাওয়া মেয়ে মনে হয় তার। মাঝারি উচ্চতা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ঘন সোনালী চুল। টাইট মিনিস্কার্ট পরে আছে এ-মুহূর্তে, গায়ে নীল সিলকের ব্লাউজ, ব্রা নেই।

'এখানে?' ভুরু নাচাল জুলিয়া।

'এক ম্যাগাজিনে আছি আমি,' হাতের বিবৃতি দোলাল এরিক। 'সংগ্রহ করতে এসেছিলাম।'

'সে তো জানিই,' মাথা দোলাল মেয়েটা। 'বলছিলাম, আজ তো সান্ড্রার বেরুতে অনেক রাত হবে,' আবার সেই উসকানির হাসি ফুটল তার মুখে। মনে মনে ভাবছে, দারুণ এক মাল গেঁথেছে তো সান্ড্রা। 'তা ড্রিঙ্কের জন্যে ইনভাইট করবে, নাকি পথ দেখব?'

ওর চাঁছাছোলা কথায় অপ্রস্তুত হলো যুবক। 'না, না, এসো। দ্যাট উইল বি আ প্লেজার।' তাকে বিস্মিত করে দিয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিল জুলিয়া, ওটা ধরল সে। পা বাড়াল ক্যান্টিনের দিকে। ভেতরে এক টেবিলে ওকে বসিয়ে দিয়ে বারের দিকে চলল এরিক। পিছন থেকে তাকিয়ে থাকল জুলিয়া।

'আগের থেকে অনেক হ্যান্ডসাম লাগছে আজ ছোকরাকে,' নিজেকে বলল সে। 'সান্ড্রার ভাগ্যটা ভাল। ভীষণ সেক্সি ব্যাটা।'

কিন্তু ওর মধ্যে এমন কি পেয়েছে ছেলেটা? ভাবতে লাগল। দেখে তো মনে হয় বয়সে ছোট না হলেও সান্ড্রার সমবয়সী হবে এরিক। ওকে মজিয়ে রাখার মত এমন কি আছে তার? যুবককে ওর জন্যে জিন আর টনিক নিয়ে ফিরে আসতে দেখে বুকের ভেতরে অন্যরকম কাঁপুনি অনুভব করল ও। আজ সান্ড্রার ছাড়া পেতে সত্যিই রাত হবে। ও একবার চান্স নেয়ার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? বেশ কিছুদিন হলো বয়ফ্রেন্ডের সাথে যোগাযোগ নেই, এমন সময়...তাছাড়া এরকম হ্যান্ডসাম...

ফিরে এসে জুলিয়ার মুখোমুখি বসল এরিক ব্রাউন। 'ওহ্,' জিনে চুমুক দিয়ে বলল সে। 'ঠিক এই জিনিসই মনে মনে আশা করছিলাম আমি। তারপর, কেমন চলছে কাজ? সোয়ালবার নিয়ে লেগে আছ নিশ্চই?'

'আর কি?' শ্রাগ করল এরিক।

সেদিন রাত দুটোয় জুলিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলো সে। ভীষণ ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে। আশা ছিল এই মেয়েটার কাছ থেকে কিছু তথ্য বের করার চেষ্টা করবে, কিন্তু হয়নি তা। এ সান্ড্রার মত নয়, গভীর পানির মাছ।

স্টর ফিওর্ড, নরওয়ে।

নর্দার্ন লাইটের হুইল হাউসের পিছনের কেবিনে বসে আছে মাসুদ রানা। ওর সামনের ছোট্ট এক টেবিলে অনেকগুলো ছবি—প্লাটা বেরগেটের রুশ আর্লি ওয়ার্নিং রাডারের।

ন্যাটোর নর্দার্ন ইওরোপিয়ান হেড কোয়ার্টার্স থেকে একটু আগে পৌঁছেছে ওগুলো। নরওয়েজিয়ান মেজর ডিলন এবং মেজর ক্লিফোর্ড, ওয়েস্টন, নেইলসন ও পলসেন ঝুঁকে পড়ে দেখছে ওগুলো।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল রাডারটা বিশেষ ধরনের ওয়েদারপ্রুফ, ডিমের মত গোল শেডের নিচে থাকবে, কিন্তু এই ছবিগুলো বলছে অন্য কথা। একেবারে খোলামেলা জায়গায় একটা ভ্যান মাউন্টেড রাডার ওটা। চারদিন হলো ওটা স্থাপন করা হয়েছে, কাজ শুরু করে দিয়েছে। খোলা জায়গা থেকে মিসাইল মেরে ওটাকে উড়িয়ে দেয়া খুবই সহজ, যদি ধারেকাছে পৌঁছানো যায়।

ওটার সামান্য দূরে একটা হাট। নিশ্চয়ই গার্ড হাউস ওটা, রানা ভাবল, এবং অ্যামিউনিশন স্টোর। স্কেল আর ডিভাইডিং রুলের সাহায্যে ম্যাপের গায়ে

জায়গাটা পিন পয়েন্ট করল মাসুদ রানা। তারপর অন্যদিকে মন দিল। ইসফিওর্ডে নরওয়েজিয়ান রেডিও স্টেশনের কাছে নতুন কিছুর নির্মাণ কাজ চলছে। দ্বিতীয় রাডার স্টেশন। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে পরেরটা বিশাল কিছু হবে। একটা ধ্বংস করা গেলে কি অন্যটার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেবে মস্কো?

শ্রাগ করল ও। ক্রেমলিনের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে জেনারেলদের মনস্তত্ত্ব আর রাজনীতিকদের বিচারের ওপর।

কিন্তু যেখানে আপাতত প্রয়োজন নেই, সেখানে যেতে রাজি নয় রানা। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন যুক্তি নেই।

ডাক ডি আরেনবার্গ। ব্রাসেলস্।

দামী ডিনারের মধ্যে সান্ড্রা কারমেনকে বিয়ের প্রস্তাব দিল এরিক ব্রাউন। মেয়েটার দু'হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে কাজটা সারল সে। 'সান্ড্রা, ডার্লিং, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। তুমি জানো আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

আনন্দে দিশেহারা অবস্থা হলো মেয়েটার, অতিসুখে পানি এসে গেল চোখে। 'ওহ্, এরিক! অফকোর্স, আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না আমি। তুমি...' কান্নায় আর অসহ্য আবেগে গলা বুজে গেল তার।

লে বাবা! এরিক ভাবল, এ যে দেখছি সত্যি সত্যি মরেছে। 'ডার্লিং, আর কিছুদিনের মধ্যে নতুন চাকরি হবে আমার। তখন তোমাকে বার্লিনে নিয়ে যাব, ওয়ানসীতে থাকব আমরা। ওয়ানসীর হাজারো পদের ফুল দেখলে পাগল হয়ে যাবে তুমি। বার্লিন কত সুন্দর শহর, না দেখলে তুমি বিশ্বাসই করবে না।'

'বার্লিন?' চোখ তুলল সান্ড্রা। 'কেন, মিউনিখ...?'

এই সেরেছে! থুক্কু। 'দুঃখিত, ডার্লিং! সারাক্ষণ মাথায় চিন্তা গিজগিজ করে, কি বলতে কী বলে ফেলেছি। আমি আসলে মিউনিখের কথাই বলতে চেয়েছিলাম, ভুলে বার্লিন বলে ফেলেছি।'

'ও-ও!'

'আমি ঠিক করেছি এই ক্রিসমাসেই বিয়ে করব আমরা। তুমি কি বলো?' এরিক প্রশ্ন করল।

'কিন্তু তার আগে আমার মার সাথে দেখা করতে হবে তোমাকে, ডার্লিং,' আদুরে গলায় বলল সান্ড্রা। স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে, বিয়ের ড্রেস, ব্রাইডসমেইড, চার্চ, ফটোগ্রাফ...

'কিন্তু...তোমার মা কিছু মনে করবে না তো?'

'না, না! কেন আপত্তি করবে?'

'যাক্,' চেহারায় স্বস্তি ফুটিয়ে তুলল এরিক।

পরদিন সান্ড্রার অ্যাপার্টমেন্টে পকেট থেকে যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনভাবে একটা টেলেক্স মেসেজ বের করল সে। 'এই দেখো, এটা আজই পেলাম।'

'কি?'

'পড়ো না!'

এক হাতে বুকের কাছে স্লীপিং গাউনটা ধরে বিছানায় উঠে বসল সান্ড্রা। মেসেজটা নিয়ে পড়তে লাগল: রিকোয়ায়্যার ফুল ইন্টারপ্রিটেটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অভ সোয়ালবার কনফ্রন্টেশন। ইওর লাস্ট ইনঅ্যাডিকোয়েট ইন মেনি রেসপেক্টস্, নোটেবলি ন্যাটো। ডিয়েট্রিচ।

মুহূর্তে এরিকের মতলব বুঝে ফেলল সান্ড্রা। চোখের সামনের সমস্ত স্বপ্ন বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগল তার।

'তুমিই বলো, এরকম সময় এসব কার ভাল লাগে?' ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল এরিক। পরনে শর্টস ছাড়া কিছু নেই। 'আমাকে সাহায্য করতেই হবে তোমার, ডার্লিং। আমার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখন এর ওপর।'

'এরিক, ডার্লিং, এ ব্যাপারে কিছু বলার উপায় নেই আমার,' করুণ স্বরে বলল সান্ড্রা। 'এমনকি স্ত্রীদেরও ভেতরের কথা স্বামীদের জানানোর নিয়ম নেই।'

'কি হবে বললে?' মধুর হাসি ফুটল এরিকের মুখে। 'আমি গোপন কথা ফাঁস করে দেব? পাগল হয়েছ? পড়োনি, ওরা লিখেছে "ইন্টারপ্রিটেটিভ"? তার মানে ওরা কেবল অ্যানালিসিস চেয়েছে, তবে অবশ্যই ফ্যাক্টসের ওপর। অনুমানের ওপর নয়।' তার কপালে চুমু খেল যুবক। 'বিশ্বাস করো, এ নিয়ে কাউকে কিছু বলব না আমি। প্রমিজ।'

এরিককে 'না' বলতে সাহস হলো না সান্ড্রার, আবার ও যা জানতে চায়, তা-ও বলতে মন চাইছে না। 'আচ্ছা,' একটু ভেবে নিয়ে বলল। 'দেখি কি করতে পারি। তবে সত্যি বলছি, আমরা শুধু মিলিটারি প্ল্যান নিয়ে ডীল করি, রাজনীতি নয়।'

'সে তো বটেই। কিন্তু সেসবও তো একটা পলিসির ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়।'

'হয়তো,' দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সান্ড্রা। 'কিন্তু এখন ওসব থাক। আমি খুব ক্লান্ত। এসো।'

আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠল এরিক। অল্প সময়ের মধ্যে জাগিয়ে তুলল তাকে, সান্ড্রাও সাগ্রহে সাড়া দিল। কিন্তু ওকে হতভম্ব করে দিয়ে একেবারে চরম মুহূর্তে ছিটকে বিছানা থেকে নেমে পড়ল যুবক। 'না!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এ অসহ্য!'

আবছা আলোয় এরিককে শার্ট-প্যান্ট তুলে নিতে দেখে বুক কেঁপে উঠল সান্ড্রার। 'কি হলো, ডার্লিং?' প্রায় কেঁদেই ফেলল সে।

'আমি চলে যাচ্ছি। যে আমাকে বিশ্বাস করে না...'

উঠে বসল সান্ড্রা, হাত বাড়িয়ে এরিকের হাত ধরতে গেল, ঝট্ করে সরে গেল সে। 'যেতে দাও আমাকে। আমার ওপর যার বিশ্বাস নেই, তাকে বিয়ে করে জীবন নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, এরিক!' প্রায় হাহাকার করে উঠল সান্ড্রা।

'সত্যি বলছি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। যেয়ো না, প্লীজ! সত্যিই আমি…' কান্নায় ভেঙে পড়ল। চোখের লবণ পানির ধারায় সমস্ত স্বপ্ন ধুয়েমুছে যেতে লাগল তার।

'সাহায্য করবে কথা দিচ্ছ তাহলে?' এগিয়ে এল এরিক ব্রাউন।

কথা বলতে পারল না সান্ড্রা, মাথা দোলাল কেবল।

চাপা ধক্ ধক্ আওয়াজ করছে নর্দার্ন লাইটের ডিজেল এঞ্জিন, ফ্যাকাসে জোছনার আলোয় উত্তরে ছুটছে ওটা, সোয়ালবারের দিকে। সাতদিন ধরে একনাগাড়ে চলছে, এবং প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত পল মিডল্যান্ডের মনে হচ্ছে, এ সত্যি নয়। হতে পারে না। স্বপ্ন দেখছে সে, অনেক লম্বা স্বপ্ন।

একসময় না একসময় স্বপ্ন ভাঙবে, তখন…প্যাট ডিলনের উচ্চকণ্ঠের হাসি কানে যেতে সচকিত হলো সে। ঘুরে তাকাল। হুইল হাউসে রয়েছে লোকটা, আমেরিকান মেজর ক্লিফোর্ডের সাথে কি নিয়ে যেন রসিকতা করছে। ক্লিফোর্ডের সুগঠিত দাঁত দেখতে পেল সে কেবল, নিঃশব্দে হাসছে। চোখাচোখি হতে পলের উদ্দেশে হাত নাড়ল লোকটা। সে-ও পাল্টা হাত নাড়ল।

লংইয়ারবিয়েনে রুশ পুলিসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরের দু'সপ্তাহ ভীষণ দুশ্চিন্তায় কেটেছে তার। এরমধ্যে অ্যানির সাথে দেখা করার সাহস হয়নি। কোথাও যেতে সাহস হয়নি, স্রেফ বাসা-অফিস, অফিস-বাসা করেছে। একদিন ফলভিক জানিয়ে গেল তাকে যেতে হবে। কোথায়? বোডো। নর্থ নরওয়ে ডিফেন্স কমান্ড ডেকেছে। দেশের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে একদিন পরই ট্রমসো আসে পল মিডল্যান্ড, নির্দেশ অনুযায়ী দেখা করে বিদেশী এক মেজরের সাথে। তার নাম মাসুদ রানা।

ট্রমসোর এক হোটেলে লোকটার সাথে দেখা হয় তার। ধরা পড়ার আগে লংইয়ারবিয়েন থেকে নিজের পাঠানো মেসেজের কপি সেই মেজরের হাতে দেখেছে পল। দু'একটা সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেই কাজের কথা তুলল মেজর।

'আপনার দেশকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক কঠিন সমস্যায় ফেলে দেয়া হয়েছে,' নিরুত্তাপ, প্রায় নির্বিকার কণ্ঠে কথাগুলো বলল সে। 'সোয়ালবারের ওপর আপনার দেশের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। রাজনৈতিক উপায়ে সে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হওয়ায় মার্কিন সরকার সামরিক উপায়ে সোয়ালবারকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে সেখানে কমান্ডো মিশন পাঠাতে যাচ্ছে। আপনি সে দলের সঙ্গে যোগ দিতে চান?'

শুনতে শুনতে দম আটকে আসছিল মিডল্যান্ডের। কোনমতে মাথা ঝাঁকাল। 'অবশ্যই চাই! যোগ দেয়ার সুযোগ পেলে আমি কৃতজ্ঞ হব।'

ব্যস, এ প্রসঙ্গে আর কিছু জানতে চায়নি মেজর। তবে কবীর চৌধুরী সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছে। লোকটা সম্পর্কে সে যা যা জানে, তার সবই বের করে নিয়েছে পেট থেকে। ওখানে কোথায় লোকটার বাসা, কোথায় অফিস, সব জেনে নিয়েছে। ট্রমসে নেভাল বেসে মেজরের অপেক্ষায় ছিল একটা সী কিং, তার

সাথে সেটায় চড়ে বোডো চলে আসে পল। সেখানে অপেক্ষায় ছিল নর্দার্ন লাইট। মেজর ক্লিফোর্ডের নেতৃত্বে। পলকে তার হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেছে মাসুদ রানা। সেই থেকে সাতদিন হলো, একটানা চলার ওপর রয়েছে ষাট ফুটী এই ফিশিং ট্রলার। এই ব্যাপারটাই বিশ্বাস হতে চাইছে না। মেনে নিতে পারছে যে সত্যিই আবার সোয়ালবার ফিরে যাচ্ছে সে।

কেন না, আসলে কোন কাজ এভাবে হয় না। জীবন নাটক নয়। অথচ এখন যা ঘটছে, সবকিছুকেই নাটক মনে হচ্ছে তার।

একটু পর হুইল হাউসে এসে বসল সে। গাঢ় সবুজ রাডার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক। ভেতরে একটা বাহু ঘুরছে, ওটার প্রতিটা চক্কর শেষ হতে পর্দায় কিছু ফোঁটামত দেখা দিচ্ছে। ওর মধ্যে তিনটে নরওয়েজিয়ান পেট্রল ক্র্যাফট। নর্দার্ন লাইটের দিকে শত্রুর এগোবার পথ সীল করে রেখেছে ওগুলো, সমান তালে তাদের সাথে সাথে চলছে। খুব শীঘ্রি পর্দার কোনায় উদয় হবে নতুন এক ফোঁটা।

ওটা হবে একটা মার্কিন ডেস্ট্রয়ার, সাউথ উইন্ড। ওটার অপেক্ষায় আছে নর্দার্ন লাইটের কমান্ডো গ্রুপ।

হঠাৎ করে ফ্রেডারিক ফলভিকের কথা খেয়াল হলো তার। গোলগাল মুখওয়ালা ছোটখাট এক মানুষ। এলোমেলো চুল। কেমন আছে সে? স্পাইঙের অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করেনি তো রাশিয়ানরা? ফায়ারিং স্কোয়াডে…! অ্যানি? ও কেমন আছে?

'সোয়ালবারের চারদিকে টোটাল সী ব্লকের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে ন্যাটো,' নিচু কণ্ঠে বলল সান্ড্রা।

এক চামচ ব্রক্কোলাই মুখে তুলতে যাচ্ছিল এরিক ব্রাউন, খবরটা শুনে এমনভাবে চমকে উঠল যে হাত থেকে চামচ পড়েই যেত আরেকটু হলে। 'কি বললে! সী ব্লকেড? সোয়ালবারের চারদিকে?'

'হ্যাঁ। তারপর এয়ার ব্লকেডও ঘোষণা করা হবে,' একই গলায় বলল মেয়েটা।

খাওয়া মাথায় উঠল যুবকের। 'কিন্তু কেন?' সান্ড্রাকে নয়, ভাব দেখে মনে হলো প্রশ্নটা নিজেকেই করছে সে। কথাটার ওজন যাচাই করছে মনে মনে।

'তা জানি না।'

'হুঁম!' অন্যদিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এতদিনে মনে হচ্ছে ন্যাটো কাজও কিছু কিছু করে, শুধু বিবৃতিই প্রকাশ করে না।'

মন্তব্যটা পছন্দ হলো না সান্ড্রার, চুপ করে চামচ নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'কিন্তু কেন তা করবে? এর কোন কারণ তো থাকতে হবে।'

'জানি না,' এবার একটু দৃঢ় শোনাল মেয়েটার গলা। 'কিন্তু যেজন্যেই হোক, তুমি আমাকে কোট করবে না বলে কথা দিয়েছ, মনে রেখো।'

'শিওর!' মনে মনে বলল, না করে উপায় আছে? অন্তত স্টাসির রেকর্ডের জন্যে তো করতেই হবে। 'মনে আছে। প্রমিজ ইজ প্রমিজ। বলেছি যখন, এ

ব্যাপারে একটা শব্দও ছাপা হবে না আমার ম্যাগাজিনে।'

একটু বিরতি। 'ব্যাপারটা কি নিয়ে হতে পারে, কিছু অনুমান করতে পারো?' আবার বলল এরিক।

'নাহ্! পারলে বলতাম।'

'কবে নাগাদ ব্লকেড ঘোষণা করা হবে?'

'এক সপ্তার মধ্যে।'

জুলিয়ার কথা ভাবল এরিক, ওর সাথে দেখা করে আরও ডিটেইলস্ কিছু বের করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখবে নাকি একবার? না, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। বিপদ ঘটে যেতে পারে। ও আর যা-ই হোক, এরমত হাঁদা নয়।

মেয়েটার সাথে একবার রাত কাটিয়ে এমনিতেই অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে এরিক, আর নয়। রাতটা প্রায় নির্ঘুম কাটল তার, সকালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সান্ড্রার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। একটা কল বক্স খুঁজে বের করে বিশেষ এক নম্বর ঘোরাতে লাগল।

এমন খবর জানাতে দেরি করলে রুশ প্রভুরা কাঁচা খেয়ে ফেলবে।

সোমবার দুপুরের দিকে বেয়ার আইল্যান্ড অতিক্রম করল নর্দার্ন লাইট। দূর থেকে ওটার ধীরে ধীরে সাগর থেকে জেগে ওঠা ও আকৃতি নেয়া দেখল পল মিডল্যান্ড।

দ্বীপটা প্রায় গোল। একটা দীর্ঘ রেডিও মাস্ট ও কয়েকটা বিল্ডিং ছাড়া কিছু নেই। কমিউনিকেশনস্ এঞ্জিনিয়াররা ছাড়া কেউ থাকে না। কী লিসনিং পোস্ট ওটা, এ ছাড়া আর কোন গুরুত্ব নেই।

'এটাকে এখনও ফেলে রেখেছে কেন ব্যাটারা?' ওয়েসটন বলল। মেজর সে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ, ষাঁড়ের মত স্বাস্থ্য। 'দখল করে নেয় না কেন?'

'এবার হয়তো নেবে,' খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে নিল পল। লংইয়ারবিয়েন ছাড়ার পর দাড়ি কামায়নি, প্রথমে ক'দিন অস্বস্তি লাগলেও এখন সয়ে গেছে। উপকারও হয়েছে, গালে ঠাণ্ডা কম লাগে। 'এখানে কোন রাশিয়ান থাকে না বলে হয়তো আগ্রহ দেখায়নি। রাশিয়া দাবি করছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের প্রতিরক্ষা চুক্তিতে নাকি বেয়ার আইল্যান্ডও অন্তর্ভুক্ত।'

রেডিওর মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। 'ওদের সাথে কথা বলা যাক।'

নরওয়েজিয়ান ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল সে বেয়ার আইল্যান্ডের সাথে। তারপর মাইক্রোফোন রেখে ওয়েসটনের দিকে ঘুরল। একই মুহূর্তে মেজর ক্রেইগ ক্লিফোর্ডও ঢুকল হুইল হাউসে।

'রেডিওতে কথা বলতে শুনে এলাম,' বলল সে। 'কি বলে ওরা?' ইঙ্গিতে পিছিয়ে পড়তে থাকা দ্বীপটা দেখাল। ঝাড়া ছয় ফুট দীর্ঘ লোকটা, হ্যাংলা। আদমের আপেল বেরিয়ে আছে, কথার তালে তালে নাচে। ঘন, জোড়া ভুরু।

'বলছে, উত্তরে সোভিয়েত নেভাল অ্যাকটিভিটি খুব বেশি। সমস্ত মার্চেন্ট লাইনারকে এই এলাকা থেকে সরে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে ওরা।'

'ওয়েদার?'

'উইন্ড ফোর্স থ্রী, সী স্টেট টু। ভিজিবিলিটি গুড।'

মাথা ঝাঁকাল মেজর। সীটে বসে মেজর ওয়েসটনের সাথে সোয়ালবারে ল্যান্ডিং নিয়ে আলোচনা শুরু করল। সাধারণ, বাণিজ্যিক কাজে নির্মিত এক ইনফ্লেটেবল রাবার বোটে চড়ে তীরে যাবে রেইডিং পার্টি। অবশ্য সে জন্যে মেঘলা আবহাওয়া বা কুয়াশার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। মিলার ও পলসেন তীরে যাবে, ওয়েসটন বোটেই থাকবে।

'কোন সমস্যা হবে না,' ওয়েসটন মন্তব্য করল। 'ভিজিবিলিটি যদি এরকম থাকে, আর ধারেকাছে রাসকি পেট্রল না থাকে, তাহলে খুব সহজেই কাজ সেরে ফেলতে পারবে ওরা।'

'কপ্টার!' হঠাৎ পল বলে উঠল। 'পুবদিকে!'

ঝট্ করে ঘুরে তাকাল দুই মেজর। সত্যিই তাই। খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে ওটা, বেশ দূরে আছে এখনও।

'নিচে যাও, ক্রেইগ,' ওয়েসটন বলল। 'কুইক!'

'শিওর।' উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। কপ্টার কাছে এসে পড়তে হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল ওয়েসটন। একদম নির্বিকার সে। নরওয়েজিয়ান ফিশিং ক্রুর নীল জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরে আছে, কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

কাছে আসতে ফড়িংটার গতি বোঝা গেল। রীতিমত ঝড়ের গতিতে আসছে। এতক্ষণ দূর থেকে সোজাসুজি আসছিল বলে বোঝা যায়নি। হুড়মুড় করে ট্রলারের মাথার ওপর এসে পড়ল ওটা, সোভিয়েত নেভাল এভিয়েশনের কামভ্। কিছুক্ষণ ওপরে ঝুলে থাকল, ওটার ডাউনওয়াশের তোড়ে চার্ট রুমের ম্যাপ-কাগজপত্র ফড়ফড় শব্দে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিছু বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল ওয়েসটন, দু'হাত তুলে সরে যেতে বলল ওটাকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।

সরল বটে কামভ, তবে যাওয়ার আগে ওয়েসটনকে নিজ দাঁতের গড়নও দেখাল পাইলট। ঘুরে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে চলে গেল দ্রুতগতিতে।

'সাহস কত!' গজ গজ করে উঠল মেজর। হুইল হাউসে ঢুকে পলকে বলল, 'তৈরি হয়ে নেয়া দরকার, মনে হয় ভিজিটর আসছে। কপ্টারটা খুব সম্ভব কোন ক্রুজার থেকে এসেছে। মস্কভা হতে পারে, কপ্টার ক্রুজার।'

এক ঘণ্টা পর রাডারে দ্রুত ধাবমান ব্লিপ ধরা পড়তে সতর্ক হয়ে উঠল সবাই–আসছে! বিনকিউলারে ওটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল ওয়েসটন। একটা ডেস্ট্রয়ার। 'ক্রেসটা ক্লাস,' বলল সে। 'কম করেও বিশ নট্ গতিতে আসছে।'

'আমাদেরকে প্রয়োজন হলে হুইস্‌ল্ বাজিয়ো,' বলল মেজর ক্লিফোর্ড। 'তৈরি থাকব আমরা।'

'দরকার হবে না,' আস্থার সাথে বলল ওয়েসটন।

এসে পড়ল ওটা। ওয়েসটন 'স্লো অ্যাহেড' দিয়ে প্রস্তুত হলো হুইল হাউস থেকে বের হওয়ার জন্যে, ডেস্ট্রয়ার তখন পঞ্চাশ গজ দূরে। দোল খেতে খেতে

এগিয়ে আসছে। ব্রিজে এক অফিসারকে দেখতে পেল সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে রংচঙে একটা ফ্ল্যাগ নাড়ছে এক সীম্যান। ফ্ল্যাগটা কিসের, বুঝে ওঠারও সময় পেল না ওয়েসটন, তার আগেই আকাশ ঢেকে ফেলল রুশ ডেস্ট্রয়ার, পাশ দিয়ে দড়াম করে মেরে বসল নর্দার্ন লাইটকে।

কাঠ ভাঙাচোরার ভয়াবহ মড়মড় আওয়াজ উঠল, কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ার জোগাড় হলো খুদে ট্রলারের। অবশ্য সামলেও নিল, সোজা হয়ে ডেস্ট্রয়ারের গায়ে খসড় খসড় শব্দে ঘষা খেতে লাগল।

ব্রিজ থেকে মেগাফোন হাতে অন্য এক অফিসার বেরিয়ে এল। গ্রেটকোট গায়ে তার, মাথায় হাই পীকড্ ক্যাপ। 'এখানে কি করছ তোমরা?' পাশের সীম্যানের হাতে ধরা ফ্ল্যাগ দেখাল। 'ইন্টারন্যাশনাল সিগন্যাল বোঝো না? তোমাদেরকে থামতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'এভাবে আমাদেরকে থামানোর কোন অধিকার নেই তোমাদের,' চেঁচিয়ে বলল পল মিডল্যান্ড। 'আরেকটু হলে...'

পাত্তা দিল না অফিসার। 'এখানে কি করছ তোমরা? এত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

'মাছ ধরতে যাচ্ছি,' ওয়েসটন বলল নরওয়েজিয়ানে। 'এটা একটা ফিশিং ট্রলার, ড্যাম ইউ!'

এবারও পাত্তা দিল না সে। আরেক লোক ক্যামেরা হাতে উদয় হলো তার পাশে, টপাটপ্ কিছু ছবি তুলে নিল নর্দার্ন লাইটের।

'চাইলে তোমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারো,' বলল অফিসার। 'আর এদিকের পানিতে আরও সাবধানে চলাচল করা উচিত তোমাদের।'

গায়েব হয়ে গেল অফিসার। গুড়গুড় করে উঠল ডেস্ট্রয়ারের শক্তিশালী এঞ্জিন। ঘুরে চলে গেল ওটা। নিচের হোল্ডের অবস্থা দেখতে এসে বোকা হয়ে গেল ওয়েসটন ও পল। বিশ্রী অবস্থা, সমস্ত জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মেজর ক্লিফোর্ড কাতরাচ্ছে। ডেস্ট্রয়ারের ধাক্কায় বাঙ্ক থেকে পড়ে গেছে সে, ডান পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে গেছে।

সেদিকে নজর দেয়ার আগে ট্রলারের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখল ওয়েসটন ও পল। না, ভাঙেনি কোথাও। ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়, তবে সেগুলো ওয়াটার লেভেলের ওপরে। ভয়ের কিছু নেই।

'কি ঘটেছে ওপরে?' ক্লিফোর্ড বলল দাঁতে দাঁত চেপে। পলসেন ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে তার পা।

'ধাক্কা মেরেছে হারামজাদারা,' পল বলল। 'ইচ্ছে করে।'

'আমরা বোধহয় বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলছি,' ডিলন বলল। 'এবার কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি মাছ ধরা উচিত। নইলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে। ওরা নিশ্চয়ই নিজস্ব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চোখ রাখছে আমাদের ওপর।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল ওয়েসটন।

নয়

সোমবার। ব্রাসেলস্।

সান্ড্রার অনামিকায় শ্যাফায়ার এবং হিরে বসানো চমৎকার আংটিটা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল জুলিয়া। 'দারুণ হয়েছে তো আংটিটা!' বলল সে। 'সত্যি, সুন্দর মানিয়েছে তোমার হাতে।'

ব্লাশ করল সান্ড্রা। 'এরিক দিয়েছে।'

'তাই নাকি? তুমি খুব লাকি বলতে হবে, অন্তত আমার চেয়ে অনেক লাকি। কংগ্রাচুলেশনস্, ডার্লিং।'

'ধন্যবাদ, জুলি।'

'তা কবে হচ্ছে শুভ কাজটা?' ঝুঁকে বসল জুলিয়া।

'ও বলেছে,' আবার ব্লাশ করল সে, 'এবারের ক্রিসমাসে।'

'কিন্তু এনগেজমেন্টের আংটি ডান হাতে কেন পরেছ তুমি? বাঁ হাতে পরোনি কেন?'

'ব্যাপারটা এখনই জানাজানি করতে চাইছি না আমরা···মানে, এরিক আর কি!' আংটিটার দিকে তাকিয়ে থাকল সান্ড্রা। ভাবছে, ওটা যদি তার কিছু কিছু সন্দেহের জবাব দিতে পারত!

জুলিয়া তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বত্রিশ পেরিয়ে গেছে, কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল না সান্ড্রার। জেনারেল অ্যান্ডারসন ওদের দু'জনকেই মেয়ের মত ভালবাসেন, সান্ড্রার একাকীত্বের দুঃখ ঘুচাবার অনেক চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। বেশ ক'জন ব্যাচেলর জুনিয়র অফিসারকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন ওর সাথে, কিন্তু ওর মধ্যে কোন 'সেক্স অ্যাপিল' নেই বলে একবার কি বড়জোর দু'বার ডেট করে কেটে পড়েছে সবাই।

সে নিজে একজন মেয়ে। সে-ও বোঝে সত্যিই সান্ড্রার মধ্যে পুরুষদের আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। কিছুই নেই। অথচ সেই মেয়েকে এরিকের মত এক লেডিকিলার ছেলে দেখেই ভালবেসে ফেলল, তাকে বিয়েও করতে যাচ্ছে, কেন যেন বিশ্বাস হতে চায় না তার। বিশেষ করে ক'দিন আগে ছেলেটার সাথে রাত কাটিয়ে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে জুলিয়ার। তার মত একজনকে পোষ মানাতে হলে চেহারায় কিছু আবেদন থাকতেই হবে, অথচ সেই জিনিসই নেই এ মেয়ের। তাহলে কি দেখে, কেন···?

দুপুরে ক্যান্টিনে লাঞ্চ করতে এসে এরিকের প্রসঙ্গ তুলল জুলিয়া, তার এবং তার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইল। কিছু সন্দেহ করে নয়, স্রেফ মেয়েলী কৌতূহলবশে। কিন্তু যখন দেখা গেল তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই সান্ড্রা জানে না, তখন বেশ অস্বস্তিতেই পড়ে গেল। বার্লিনে তার বাড়ি, অথচ কোন বার্লিন, পুব না পশ্চিম জানে না বোকা মেয়েটা।

কেন যেন হঠাৎ করে উরসুলার কথা মনে পড়ে গেল তার। সে-ও তাদেরই মত মহাসচিবের পি.এ ছিল। সান্ড্রা-জুলিয়া যে রুমে বসে, সেই রুমেই বসত। তখন অবশ্য সে ছিল না, সান্ড্রা ছিল। পশ্চিম জার্মানির মেয়ে ছিল সে। '৮২ সালে হঠাৎ একদিন…চিন্তার মোড় ঘুরে গেল জুলিয়ার। ভাবছে, এরিক তার প্রেমিকাকে এত আঁধারে রেখেছে কেন?

সময় থাকতে জেনারেলকে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানাবে নাকি সে? নাহ্, সেটা ঠিক হবে না। বরং…দুপুরের পর গোপনে লন্ডনে ফোন করল সে, সেখানকার ন্যাটোর এক মাঝারি গোছের সিকিউরিটি অফিসারের সাথে কথা বলল। তার নাম ফিলপট, প্রায়ই আসা-যাওয়া করে এখানে।

'কি ম্যাগাজিনে চাকরি করে বললে?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'আকুতুয়েলে নাখ্‌রিখ্‌তেন,' জুলিয়া বলল।

'ক্রাউট, কেমন?' হাসল ফিলপট। 'আকুতুয়েলে নাখ্‌রিখ্‌তেন?…ওকে, সিলি গার্ল, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

দুশো মাইল দূরে, লন্ডনে নিজের অফিসে এরিক ব্রাউন সম্পর্কে তখনই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল ফিলপট।

ফরনিবু এয়ারপোর্ট, অসলো। বুধবার।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ার সার্ভিসের এক ডিসি-৯ দাঁড়িয়ে আছে মেইন টার্মিনাল ভবনের একটু দূরে। আগামীকাল রাতে ভবনের কাছে আসবে ওটা, একদল নরওয়েজিয়ান খনি শ্রমিক নিয়ে সোয়ালবার যাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক ফ্লাইটে। একদল শ্রমিক ছুটি শেষে কাজে ফিরে যাবে, আরেক দল ছুটি নিয়ে দেশে আসবে। কিন্তু সময়মত কোন শ্রমিক থাকবে না প্লেনে। কেবল কমান্ডো বাহিনী থাকবে।

দুপুরের একটু পর এমএএসের ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম ও পীকড্ ক্যাপ পরা দুই পাইলট বের হয়ে এল টার্মিনাল ভবন থেকে। তাদের মধ্যে একজন মাসুদ রানা। পাইলটের ব্যাজ চক্‌চক্ করছে ওর বুকে। দৃঢ় পায়ে গ্যাঙওয়ে বেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে।

ক্রুরা কেউ নেই ভেতরে, গ্রাউন্ড ক্রুরা আছে অবশ্য, হুইলের সার্ভিসিঙের কাজে ব্যস্ত। গত কয়েকদিন ধরেই চলছে ওটার 'সার্ভিসিং'। নোজ হুইলে 'সমস্যা'।

ভেতরে ঢুকে ব্যস্ত পায়ে পিছনদিকে চলল রানা। লেজের কাছের ল্যাভেটরির কাছে এসে থামল। ওকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল ক্যাপ্টেন, সরু একটা দরজা আছে ওখানে, ভেতরদিকে খোলে। হাত বাড়িয়ে ওটা খুলে ফেলল সে। একটা মোচাকৃতির ফাঁকা অংশ বেরিয়ে পড়ল। ওখানে ডানদিকে একটা ছিটকিনি আছে দেয়ালের গায়ে, সেটা খুলে ভেতরের একটা লিভার টেনে দিল সে। মৃদু গুঞ্জনের সাথে ফ্লোরের একটা অংশ সরে গেল, দেড় ফুট বাই দেড় ফুট একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল।

'সী?' হাসল লোকটা। 'গুড বাই বলে সোজা হেঁটে নেমে যাবেন।'

মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। চিন্তিত।

'বেলসান্ড রেডিও স্টেশন থেকে কত কিলোমিটার দূরে জাম্প করতে চান, স্যার?'

'আট কিলোমিটারের মধ্যে,' বলল ও।

'পাহাড় ও সাগরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ক্যালকুলেটর বের করল লোকটা। হিসেব কষতে লেগে পড়ল। 'আমাদের গতি থাকবে তখন একশো দশ নটস্। বেলসান্ড অতিক্রম করার দু'মিনিট বিশ সেকেন্ড পর জাম্প করতে হবে আপনাদেরকে। পাঁচ হাজার ফুট ওপর থেকে।'

একটু ভাবল রানা। গ্রাফ পেপারের একটা ফোল্ডার শীটে চোখ বোলাল। ওই এলাকার পাহাড়ের উচ্চতা, দূরত্ব ইত্যাদি মার্ক করা আছে ওটায়। হিসেব সেরে মুখ তুলল। 'বেলসান্ডের দু'মাইলের মধ্যে নামতে পারলে আরও ভাল, কাজ তাড়াতাড়ি হবে। রুশ রাডার আছে লংইয়ারবিয়েনে, দেড় হাজার ফুট উচ্চতায়। ওটা নিশ্চই ট্র্যাক করবে আমাদের। বেলসান্ডে ওর চেয়ে অনেক উঁচু পাহাড় আছে, ওগুলোর মধ্যে জাম্প করা গেলে আড়াল পাব আমরা, রাডার টের পাবে না। পাহাড় পর্দার কাজ করবে।'

'ফ্রী কল করলেও ধরতে পারবে?'

'যদি অতিরিক্ত সতর্ক থাকে, নিশ্চয়ই পারবে। মেঘ থাকলে স্যাটেলাইট ক্যামেরা টের পাবে না অবশ্য।'

একটু ভাবল ক্যাপ্টেন। 'যদি মাটি দেখা না যায়?'

শ্রাগ করল রানা। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

'...উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তা তত বাড়ছে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ব্যারেন্ট সীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক ফ্লীট এবং রুশ নৌ-বাহিনী এমুহূর্তে প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। গতকাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোয়ালবারে রুশ আর্লি ওয়ার্নিং রাডার সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বলে মন্তব্য করার পর নতুন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

'পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ওই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত ব্যাপক সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন ফুল-স্কেল নেভাল ব্লকেডের ইঙ্গিতই বহন করে। বিবিসি লন্ডন থেকে...'

রিমোট কন্ট্রোলের বাটন টিপে টিভি অফ করে দিল রানা। উঠে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল। অসলোর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লাক্সারি স্যুইট এটা। গত চারদিন থেকে এখানে আছে ও আর সোহানা। অন্যরাও আছে। আজই শেষ রাত, কাল যাত্রা শুরু হবে। চূড়ান্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

কাল রাহাত খান আর অ্যাডমিরাল কিং আসছেন ওদের দলকে বিদায় জানাতে। আজ দুপুরে খবরটা পেয়েছে ওরা, তখন থেকে মনটা খুশি-খুশি লাগছে। এমন ঘটনা খুব বিরল। বেডরুম অন্ধকার দেখে চোখ কুঁচকে উঠল ওর, ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি সোহানা? বাঁ দিক থেকে ঘরে চাঁদের আলো আসছে দেখে তাকাল, দেখল জানালার পর্দা সরিয়ে মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে আছে ও। ফরসা

মুখটা ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়। নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়াল রানা, পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। 'কি করছ?'

'চাঁদ দেখছি,' বলল ও। 'কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'বাংলাদেশের মত অত স্নিগ্ধ চাঁদ আর কোথাও ওঠে না।'

নীরবে মাথা দোলাল ও, ঠিকই বলেছে সোহানা।

ব্রাসেলস।

'কি যেন নাম তোমার বয়ফ্রেন্ডের?' বলল ফিলপট। 'এরিক ব্রাউন, না?'

'হ্যাঁ,' একটু বিস্মিত হলো সান্ড্রা। এই লোকটা এরিকের নাম জানল কি করে ভাবছে। তাছাড়া, কথা নেই বার্তা নেই, ইংল্যান্ড থেকে এসেই এমন প্রশ্ন, কেন?

'কি করে সে?'

'এক জার্মান ম্যাগাজিনের...'

'ও, হ্যাঁ,' বাধা দিল ফিলপট। 'আকুতুয়েলে নাখ্‌রিখ্‌তেন, তাই তো?'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আমি জানলাম কি করে?' মেয়েটাকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল লোকটা। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মত বয়স তার, খাটো। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চাউনি অন্তর্ভেদী। 'জুলিয়া বলেছে।'

'জুলি! বুঝলাম না, ও কেন...'

'আমি যা প্রশ্ন করি,' বাধা দিল ফিলপট, 'তুমি কেবল তার জবাব দেবে। কেন, কি, এসব প্রশ্নের উত্তর পরে দেয়া হবে। ওকে?'

চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সান্ড্রা। বুক কাঁপছে। কি হচ্ছে এসব? মাথা ঝাঁকাল।

'গুড! ওই পত্রিকার হয়ে ন্যাটো কাভার করছে এরিক, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মাঝেমধ্যে তোমার কাছে এখানকার ভেতরের খবরও জানতে চায়?'

'না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'আমাকে তো কখনও কিছু জিজ্ঞেস করে না।'

ঝুঁকে বসল ফিলপট, পারিবারিক ডাক্তারের মত সতর্কতার সাথে রোগীকে পরীক্ষা করছে। যেন কঠিন অসুখ করেছে তার, কথাটা কি করে বলবে ভাবছে। 'সান্ড্রা, এবার উত্তর দেয়ার আগে ভাল করে ভেবে দাও, প্লীজ। লোকটা কখনও আমাদের মিলিটারি প্ল্যানিং সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে?'

'হ্যাঁ,' বেশ কিছুক্ষণ পর বলল সে। 'একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু আমি জবাব দিইনি।'

'ইদানীং সোয়ালবার প্রসঙ্গ নিয়েই ও বেশি আগ্রহী, তাই না?'

লোকটার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ভাল ঠেকছে না সান্ড্রার। ভেতরটা কুঁকড়ে উঠতে শুরু করেছে। আজকের নয়, বেশ কয়েক বছরের পরিচিত তার ফিলপট। ন্যাটোর পদস্থ অফিসার, প্রায়ই লন্ডন থেকে আসা-যাওয়া করে। তার ও জুলিয়ার সাথে

খুবই আন্তরিক, প্রায় বন্ধুর মত আচরণ করে এসেছে এতদিন। আজ কি হলো সেই লোকের? এমন গম্ভীর কেন? এরিকের ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন তার?

মাথা নাড়ল ও, মুখ খুলতে সাহস হলো না।

'আবার বলো, আমাদের সোয়ালবার প্ল্যানিং সম্পর্কে ওকে কিছু বলেছ, বা আভাস দিয়েছ?'

ভয়ে, অজানা আশঙ্কায় কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'না, কেন বলব? কেন বারবার একই প্রশ্ন করছেন?'

'সরি, ডিয়ার,' কোটের ব্রেস্ট পকেট থেকে ভাঁজ করা সাদা একটা রুমাল বের করে এগিয়ে দিল ফিলপট। 'নাও। চোখের পানি মোছো। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।'

ওকে সামলে নেয়ার সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল লোকটা, নিচু গলায় এরিক ব্রাউন সম্পর্কে নিজের আহরণ করা তথ্য বলতে শুরু করল। অবিশ্বাসে চোয়াল ঝুলে পড়ল সান্ড্রার, বুক-গলা শুকিয়ে উঠল।

'আমি বিশ্বাস করি না!' ফিলপট থামতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও। 'অসম্ভব! অসম্ভব! ও স্পাই হতে পারে না! এতবড় প্রতারণা করতে পারে না ও আমার সাথে!'

'তাই?' ঠাণ্ডা গলায় বলল সিকিউরিটি অফিসার। 'তাহলে পরেরবার যখন তার সাথে দেখা হবে, জিজ্ঞেস কোরো তো গত সোমবার রাতে কোথায় ছিল সে।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সান্ড্রা। 'গত সোমবার?'

'হ্যাঁ, যেদিন ডিফেন্স প্ল্যানিং কমিটির মীটিং হয়েছিল।'

'কোথায় ছিল!' অস্ফুটে বলল ও।

'জুলিয়ার সাথে. বিছানায়।'

বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা।

[illegible]র বুক চিরে সোয়ালবারের দিকে ছুটে চলেছে এসএএসের ডিসি-৯। এখানে রাত বটে, কিন্তু উত্তরে তা নয়। ঘড়ির হিসেবে রাত হলেও ওদিকে প্রায় দিনের মতই আলো, কেবল একটু ফ্যাকাসে, এই যা।

প্লেনে যাত্রী থাকার কথা একশো তেইশজন, সোয়ালবারের খনি শ্রমিক। কিন্তু আসলে একজনও নেই তাদের, আছে কেবল মাসুদ রানা ও সোহানাসহ ভার্জিনিয়া রিজ এ গ্রুপের সাত সদস্য। দলটা বেলসান্ডের কাছে ফ্রী ফল করলে ফিরে আসবে ডিসি-৯, লংইয়ারবিয়েন এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলকে অজুহাত হিসেবে জানাবে ল্যান্ডিং গিয়ার আটকে গেছে, নামছে না। এটা টেকনিকাল সমস্যা, যখন-তখন ঘটতেই পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে পাঁচ কমান্ডো—হাওয়ার্ড স্মিথ, মিলার, জনসন, ত্রেভিনস্কি ও বাকহার্ড। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। রানা-সোহানা বসেছে পাশাপাশি। সোহানা চোখ বুজে থাকলেও সজাগ, রানা জানে। ওর নিজেরও ঘুম আসছে না। মাথায় নানান চিন্তা। মূল চিন্তা সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে জায়গামত

নামতে পারবে কি না। না কি ফ্রী ফলের সুবিধে মাঠে মারা যাবে।

প্যারাশুট জাম্প করলে মানুষের চোখ এড়ানো সম্ভব হয় না, কিন্তু ফ্রী ফলের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। খুবই সাধারণ ব্যাপার। প্যারাশুট পরেই জাম্প করতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওটা না খুলে, মাটির যত কাছে সম্ভব নেমে এসে খুলতে হয়। এতে চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রায় থাকেই না।

এ যাত্রা তাই করতে যাচ্ছে রানা। তাতে সমস্যা নেই, ফোর্ট ব্র্যাগে বহুবার ফ্রী ফল প্র্যাকটিস করেছে সবাই। ওর চিন্তা জায়গামত নামতে পারবে কি না, অথবা অজায়গায় গিয়ে পড়তে হবে কি না। সোহানা উসখুস করছে দেখে ওর হাত মুঠোয় তুলে নিল রানা। 'ভয় করছে?'

'না,' রানার কাঁধে মাথা রাখল ও। 'তোমার?'

'আমার করছে,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল রানা।

'কেন?' সোহানা মুখ তুলল, ডিম লাইটের মৃদু আলোয় ভাল করে ওকে দেখার চেষ্টা করল।

'প্রথম ভয় তুমি, দ্বিতীয় ভয়, সাগরে পড়ি না পাহাড়ে!' রানা বলল।

'দ্বিতীয়টা বুঝি, যুক্তি আছে। কিন্তু প্রথমটা কেন?'

'জানি না,' শ্রাগ করল ও। 'তবে ভয় করছে, স্বস্তি পাচ্ছি না।'

আবার কিছুক্ষণ ওকে দেখল সোহানা। মৃদু গলায় ডাকল, 'রানা!'

'উঁম!'

'খুব ভালবাস আমাকে?'

ঘুরে তাকাল ও। 'এ কেমন প্রশ্ন হলো?'

'আহা, বলোই না!'

'তোমার কি মনে হয়?'

একটু সরে বসল সোহানা। চোখ কুঁচকে তাকাল। 'ফের ত্যাড়া কথা? সোজা কথা সোজা করে বললে কি হয়? বলো!'

'কি বলব?'

'আমি যা জানতে চাইছি তার উত্তর।'

'তোমাকে ভালবাসি কি না?' ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ও। 'নাহ্, নিজেকে ভালবাসি।'

রাগল না সোহানা, বরং হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। 'আমি জানতাম এই কথাই বলবে তুমি।'

'জানোই যদি, জিজ্ঞেস করো কেন?' রানাও হাসল। 'তোমাকে আমি নিজের থেকে আলাদা ভাবতে পারি না। কোনদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

রানার কাঁধে মাথা রাখল সোহানা। 'ধন্যবাদ, রানা!' বলল কাঁপা গলায়।

রানা চেয়ে দেখল, মুখে হাসি, কিন্তু চোখ দিয়ে পানি ঝরছে সোহানার।

ট্রমসোয় রিফুয়েলিং সেরে আবার আকাশে উঠল বোয়িং, সগর্জনে উড়ে চলল গন্তব্যের দিকে। এখনও প্রায় তিন ঘণ্টার পথ, তাই খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়ার আয়োজন করল ওরা। দেহ ঘড়ির হিসেবে এখন মাঝরাত, তাই ঝিমুনি আসতে সময় লাগল না। সোয়ালবার পৌঁছতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতে উঠে পড়ল

সবাই, ঝট্‌পট্‌ প্যারাশুট বেঁধে নিল পিঠে। ওগুলোর সাথে ব্যারোমেট্রিক ওপেনিং ডিভাইস সেট করা। কেউ সময়মত ক্যানোপি রিলিজ না করলে দু'হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছে এমনিতেই খুলে যাবে ওগুলো।

ওয়ার বেল্টের সাথে ঝুলছে পিস্তল ও ছুরি। একটা করে স্ট্রোব লাইটও আছে সবার সঙ্গে। ফ্লোরে রাখা আছে সাতটা লম্বা, ধূসর রং করা অ্যালুমিনিয়ামের টিউব। ওর মধ্যে ফোল্ডিং স্কি সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই আছে। এছাড়া একটা করে মিনি রেডিও আছে সবার সঙ্গে, অল্প দূরত্বে কথা বলার জন্যে।

প্রত্যেকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা, ঠিকই আছে। চোখের সামনে সোয়ালবার এলাকার টপোগ্রাফি ভেসে উঠল—ওখানকার মূল দ্বীপ, স্পিটসবার্গেনের গঠন দাঁতের মত, প্রান্ত দক্ষিণে মুখ করা। তার পশ্চিম উপকূলে বেশ কয়েকটা ফিওর্ড আছে, সবচেয়ে বড় দুটো হচ্ছে বেলসান্ড ও ইসফিওর্ড। দুটোর মাঝখানে পঁচিশ মাইল প্রশস্ত পাহাড়ী ভূমি। লংইয়ারবিয়েন আর রুশ সেটলমেন্ট ব্যারেন্টসবার্গ, দুটোই তার উত্তরে। বেলসান্ড ও ইসফিওর্ডে ছিল দুটো নরওয়েজিয়ান রেডিও স্টেশন। তবে এখন আর নরওয়েজিয়ান নেই, রুশদের মর্জিমত চলে।

সময় ঘনিয়ে আসতে ককপিট্‌ থেকে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল ওদের ডিসপ্যাচার। লোকটা সার্জেন্ট, স্কিয়েগার।

'লংইয়ারবিয়েন জানাচ্ছে, দুশো ফুট ওপরে মেঘ আছে। ক্যাপ্টেন জানতে চাইছে ওকে কি না,' বলল লোকটা।

'ওকে,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। সার্জেন্ট ককপিটে ফিরে যেতেই উচ্চতা কমতে লাগল প্লেনের, একই সাথে গতিও। এখন অন্যরকম আওয়াজ করছে এঞ্জিন। সার্জেন্ট ফিরে এল, মাথায় হেডফোন পরে, পিছনের মোচাকৃতির দরজাটা খুলে দিল। ফাঁক হয়ে গেল ফ্লোর, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় শুরু হয়ে গেল ভেতরে। প্রচণ্ড বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ে বেড়াতে লাগল খবরের কাগজ ইত্যাদি।

ইয়ারপীস কানের সাথে লেগেই আছে, তবু ওটাকে এক হাতে ঠেসে ধরে রেখেছে সার্জেন্ট, ক্যাপ্টেনের নির্দেশের জন্যে প্রস্তুত। একটু পর এক হাত তুলল সে কোপ মারার ভঙ্গিতে। 'অ্যাকশন স্টেশনস্‌!'

গায়ে গায়ে লেগে ফাঁকটার দিকে মুখ করে দাঁড়াল দলটা। পায়ের সাথে বাঁধা টিউব বাঁ হাতে বুকের সাথে ধরে রেখেছে। বেরিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে। স্মিথ রয়েছে সবার আগে, তারপর ত্রেভিনস্কি, জনসন, বাকহার্ড, মিলার, সোহানা এবং সবার পিছনে রানা। প্লেনের ভেতরটা ভরে গেছে ঘন মেঘে, একজন অন্যজনকে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকমত।

উঁচুতে দু'আঙুল তুলে ধরল সার্জেন্ট, উত্তেজনায় টান্‌টান্‌। মধ্যমা ভাঁজ করল সে, এক মুহূর্ত পর তর্জনী, সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। 'গো!'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে প্লেন থেকে স্রেফ হেঁটে বেরিয়ে গেল দলটা, স্লিপ স্ট্রীমের হ্যাঁচকা টানে দিক্‌ হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা, মেঘ ফুটো করে নেমে যেতে থাকল হু-হু করে। কয়েকশো ফুট নেমে এসে নিজেকে ফিরে পেল, টিউবটা ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের ভঙ্গি ঠিক করে নিল—দু'পা বাইরের দিকে ছড়ানো,

হাত সামান্য ভাঁজ করা, যেন তালুর ওপর দেহের ভর রাখতে যাচ্ছে। বাতাসের তোড় বাড়ছে।

খানিকটা নিচে, ডানদিকে দুটো কালো ফোঁটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল ও, সমান গতিতে নামছে। তারপর নেই হয়ে গেল। বুকে বাঁধা রিজার্ভ প্যারাশুটের সাথে সেট করা আল্টিমিটার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও: ৩২০০…৩০০০…২৮০০। অল্পক্ষণের মধ্যে মিনিটে দশ হাজার ফুট করে নামা শুরু হবে।

নিচে কয়েকটা ক্যানোপি দেখতে পেল ও। গুনে দেখার চেষ্টা করল, হলো না, থেকে থেকে ঘন কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। চার সেকেন্ড পর ক্রোম হ্যান্ডেল ধরে টান দিল, কাঁধের হার্নেসে ঝাঁকি লাগল, ওপরে ফড়াৎ শব্দে খুলে গেল ক্যানোপি। ঠিক ক্যানোপি নয়, ইনফ্লেটেড উইং। আল্টিমিটারে ১৯০০ উঠল। এখন প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ষোলো ফুট করে নামছে রানা। ওপরে কোথাও গর্জন করছে ডিসি-৯।

হঠাৎ করে পায়ে বাঁধা কন্টেইনারটার কথা খেয়াল হতে ভয় ধরে গেল মনে। যদি বাইচান্স পানিতে গিয়ে পড়ে ও, তাহলে মুহূর্তে তলিয়ে যাবে ওটার টানে। অথচ কিচ্ছু করার নেই এখন ভাগ্য আর পাইলটের হিসেবের ওপর নির্ভর করা ছাড়া। গুটটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু তাতে ফল উল্টোও হতে পারে। হয়তো দেখা যাবে ও নিজেই নিজেকে ঠেলে নিয়ে গেছে পানির দিকে।

আল্লার নাম স্মরণ করে নিচে তাকাল। নাকেমুখে লেগে থাকা কুয়াশা জমাট বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। আড়াইশো ফুটে নেমে নিচে ঝক্‌ঝকে বরফের মাঠ চোখে পড়তে জানে পানি এল ওর। ল্যান্ডিং হলো নিখুঁত। বাতাসের দিকে ক্যানোপি ঘুরিয়ে দিয়ে ঝুপ্ করে নেমে পড়ল।

শুট সামলে দ্রুত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ও, হাতে ওয়ালথার তৈরি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সঙ্গীদের প্রত্যেককে দু'পায়ে খাড়া দেখতে পেয়ে আনন্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। কম্পাস বের করে বেয়ারিং নিল।

পুবদিকে চলে গেছে তুষারের একটা ঢাল, উঁচু হতে হতে সম্ভবত মাইল দুয়েক দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে মেঘের মধ্যে। পশ্চিমে ওদের আরভি, ওটাও দু'মাইল দূরেই। ওদের কাছে 'বীচ ইয়েলো' নামে পরিচিত জায়গাটা।

পল মিডল্যান্ড ওখানে এ গ্রুপের অপেক্ষায় থাকবে জনসনের রেডিও সেট নিয়ে।

গ্রুপ বি নিশ্চয়ই প্লেনের আওয়াজ শুনেছে, ভাবল রানা। 'এভরিবডি ওকে?'

'ইয়েস, স্যার!' বলল স্মিথ। 'অল ইন গুড হেলথ্ অ্যান্ড গুড শেপ্।'

নীরবে কাজে হাত লাগাল সবাই। কন্টেইনার খুলে কিট প্রস্তুত করল, তারপর টিউব ও প্যারাশুট সতর্কতার সাথে পুঁতে ফেলল তিন ফুট তুষারের নিচে। কাজ শেষ হতে সবাইকে দেখে নিল রানা। 'রেডি?'

নীরবে মাথা দোলাল সবাই।

'লেট'স মুভ!'

এক সারিতে সতর্কতার সাথে এগোল গ্রুপ এ। পিঠের সাদা রঙের প্যাকের ভারে একটু কুঁজো হয়ে আছে প্রত্যেকে, কাঁধে সাদা রং করা রাইফেল। বিনা

বাধায় জায়গামত পৌঁছল দল, বীচ ইয়েলোর কিছুটা দূরে, গাছের আড়ালে থেমে চোখে বিনকিউলার লাগাল রানা।

কেউ নেই। উপকূল ফাঁকা। চিকচিক্ করছে বে, পানিতে ভাসছে সমতল বরফের ছোটবড় টুকরো। পুরো ল্যান্ডস্কেপে চোখ বোলাল রানা, নেই কেউ। তীরে সব অনড়, কিচ্ছু নড়ছে না। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর, এরকম তো হওয়ার কথা নয়! ঘুরে সঙ্গীদের দেখল ও, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। নিঃশ্বাস ছাড়ছে ধোঁয়ার মত।

'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা,' ঘোষণা করল ও। 'এরমধ্যে পলের দেখা না পেলে রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করতে হবে।'

তার যেন দরকার না হয়, মনে মনে বলল। রুশ লিসনিং পোস্ট ধরে ফেলতে পারে। খুব বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। কিন্তু সময় ফুরিয়ে আসছে দেখে আর কোন উপায় রইল না। প্যাক থেকে ছোট একটা পিআরসি-৭৭ রেডিও বের করল রানা। এরিয়েল তুলে ফ্রিকোয়েন্সি টিউন করল, কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনল কিছুক্ষণ, তারপর সেকেন্ডের জন্যে টিপে দিল ট্রান্সমিশন সুইচ। একটা 'ক্লিক্' আওয়াজ উঠল। একটু চিন্তা করে সংক্ষিপ্ততম মেসেজটা মনে মনে সাজাল রানা, লম্বা দম নিল। আরেকবার সুইচ টিপে পাঠিয়ে দিল সেটা।

'ইন্ডিয়া হুইস্কি চার্লি। দিস্ ইজ ডিক্সি সিক্স। ইন্টারোগেটিভ ইয়েলো আউট।'

জবাবটা এল বেশ কিছুসময় পর। ক্লিফোর্ডের গলা ভেসে এল। 'সিক্স নেগেটিভ রেড আউট।'

স্বস্তি ফুটল সবার চেহারায়। এরিয়েল গুটিয়ে সেট জায়গামত রেখে দিল রানা। ক্লিফোর্ডের জবাবের অর্থ, এগিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। পাহাড়ের দিকে। আবার যাত্রা করল দল, এবার স্কিতে চড়ে। থেমে থেমে, ম্যাপ ও কম্পাসের সাহায্য নিয়ে এগোল রানা। সোহানা প্রায় ওর পাশাপাশি রয়েছে। কয়েকশো মিটার যেতে সামনেই কিছু একটা দেখতে পেয়ে হাত তুলে 'ডাউন!' সঙ্কেত দিল রানা, ঝপ্ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি অন্যরাও। অনড় হয়ে পড়ে আছে।

বিনকিউলার চোখে লাগাল রানা। হাতের কাছেই রয়েছে এম-সিক্সটিন রাইফেল। সত্যিই কিছু রয়েছে সামনে, অনেকগুলো গাঢ় আকৃতি, চলছে। কুয়াশায় বোঝা যাচ্ছে না ওগুলো কি। শত্রু? কিন্তু তা হয় কি করে?

বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে যেতে হঠাৎ কাঠামোগুলো চিনতে পারল ওরা। শত্রু নয়, বন্ধু ওরা। রেইনডিয়ার–কয়েক হাজার। গ্রুপ এ-র যাত্রাপথের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি উত্তরে যাচ্ছে। উপকূলের বরফ-মুক্ত ঘাসজমির খোঁজে সম্ভবত। বেশি বড় নয়, কেননা পা খাটো হয় রেইনডিয়ারের। দেহও ছোটখাট। গায়ের রং ধূসর সাদা, শাখা-প্রশাখাওয়ালা শিং, চোখের চারদিকে প্রায় কালো পশমের চমৎকার একটা বৃত্ত থাকে।

সোয়ালবারে দশ হাজারেরও বেশি বলগা হরিণ আছে, তথ্যটা জানে মাসুদ রানা। একটা কথা খেয়াল হতে হাসি পেল। মানুষে আর বলগা হরিণে ওজনের দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই, সেই সাথে এ মুহূর্তে ঘন পশমে ঢাকা পুরু

চামড়ার নিচে জন্তুগুলোর দেহের তাপমাত্রা আর আর্কটিক ক্রোদিঙের নিচে ওদের দেহের তাপমাত্রা, দুটোই প্রায় এক। আকাশে যদি এ মুহূর্তে কোন রাশান ফটোগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটার থাকে, মেঘের আড়াল থেকে তার ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফ রেকর্ডিং সিস্টেম যদি নিচে কি আছে অ্যানালাইজ করে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে হাজার হাজার খুদে ডট ধরা পড়বে তার চোখে। বডিহীট এক হওয়ায় ওগুলোকে রেইনডিয়ারই ভাববে সেটা। ওদেরকে সনাক্ত করতে পারবে না।

ধীরগতির পালটা ওদেরকে অতিক্রম করতে প্রায় দশ মিনিট সময় নিল। তারপর আবার এগোল ওরা।

'আজ সকালে বেলসান্ডের কাছে দুটো রেডিও ট্রান্সমিশন পিক্ করেছে আমাদের ইলেকট্রনিক ইন্টেলিজেন্স,' বলল কর্নেল ম্যাকারভ। 'দুটোই খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। জায়গাটা উপকূলের কাছাকাছি, সাতাত্তর ডিগ্রী ছেচল্লিশ মিনিট নর্থ, বারো ডিগ্রী উনত্রিশ মিনিট ইস্ট।'

চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে ছিল কবীর চৌধুরী। সে থামতে অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল। 'তারপর?' বলল দেয়ালের ম্যাপে চোখ রেখে।

'ওই এলাকায় কোন ন্যাটো শিপ নেই,' বলে চলল কর্নেল। 'অথচ ট্রান্সমিশন দুটো ছিল শর্ট-রেঞ্জ ভিএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সির। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয় বলে আমি তাৎক্ষণিকভাবে ইনফ্রা-রেড ফটোগ্রাফিক কভারেজের নির্দেশ দিয়েছি।'

'গুড! ঠিকই করেছেন।'

'দুটো মেসেজের একটায় "ইয়েলো", অন্যটায় "রেড" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, স্যার। আমার ধারণা আমেরিকা কোন ক্ল্যান্ডেস্টাইন কমান্ডো মিশন পাঠিয়েছে। ওটা হয় এরইমধ্যে ল্যান্ড করেছে, নয়তো করতে যাচ্ছে।'

উন্মাদ আমেরিকানরা যদি সত্যিই রেইড করার পরিকল্পনা করে থাকে, ভাবল সে, তাহলে বেলসান্ডই তাদের ল্যান্ড করার উপযুক্ত জায়গা। সবার অলক্ষে ওখানে অবতরণ করতে পারে তারা। কপ্টারে চড়ে দুই রাডার সাইটের যে কোনটার কাছে এসে নামতে পারে। হঠাৎ সেই ট্র্যাপারস' হাটের কথা মনে পড়ল তার। ঠিক করল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে একটা অ্যামবুশের ব্যবস্থা করতে হবে।

কবীর চৌধুরী নিজের চিন্তায় মগ্ন। ভাবছে, তার বাকি দশ বিলিয়ন আদৌ আর পাওয়া যাবে কি না। মস্কো তাকে প্রথমেই অনুরোধ করেছিল রাডার স্থাপনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে সে যেন মস্কোর প্রতিনিধিত্ব করে। কাজটা শেষ হলেই বাকি টাকা দিয়ে দেয়া হবে। মনে মনে তিক্ত হাসি হাসল সে।

তখন যেমন ভেবেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তেমনভাবে ঘটছে না। আমেরিকা একটু কিছু হাঙ্গামার সৃষ্টি না করে ছাড়বে না। কমান্ডো মিশন যে আসছে, সে খবর স্টাসির মাধ্যমে আগেই পেয়েছে মস্কো। তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। সত্যিই যদি তারা এসে পড়ে থাকে···

'ইসফিওর্ড রেডিও সাইটে কড়া গার্ডের ব্যবস্থা করুন, পলকভনিক,' বলল সে। 'ওটাই বেশি জরুরী।

'গতরাতে মারমানস্ক থেকে ওখানকার মেইন রাডার মাস্ট নিয়ে যাত্রা করেছে জাহাজ। আমার সন্দেহ আমেরিকান স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফিতে ওটার লোডিং ধরা পড়ে গেছে। সাইটটা যদি ধ্বংস হয়, তাহলে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে।'

ম্যাপের দিকে তাকাল কর্নেল। উত্তর উপকূলের কাছের পাহাড়ী রেঞ্জ যেখানটায় তীরের খুব কাছাকাছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিচ্ছিন্ন ইসফিওর্ড রেডিও স্টেশন। জায়গাটা প্রায় সমতল। কোন রেইডিং পার্টি যদি ওটার কাছে যেতে চায়, তাহলে সাগর আর পাহাড়ের মধ্যেকার সরু ফানেলের মত এক চিলতে জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে।

'ওখানে ব্যাটাদের ইঁদুরের মত তাড়া করে মারব আমরা,' বলল সে। ওদের দক্ষিণে রিট্রিট করার পথ বন্ধ করে দিয়ে...'

'ওই কাজটি করা চলবে না,' বাধা দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'ওদেরকে জ্যান্ত ধরতে হবে।'

অবাক হলো ম্যাকারভ, কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে বলল, 'উইথ রেসপেক্ট, স্যার। ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকলে ওখানে পা রাখার ঝুঁকি ওরা নিত বলে মনে হয় না আমার।'

'সে সব আমি জানি না, পলকভনিক। এ কাজ এক হিরোর। আমি জানি আপনিই সেই হিরো। কে জানে, হয়তো আরেকটা মেডেল...' কথা শেষ করল না সে।

বেরিয়ে এল কর্নেল, তার জন্যে অপেক্ষমাণ কপ্টারে চড়ে ব্যারেন্টসবার্গের দিকে চলল। সেখানে পৌঁছে ভ্যান মিয়েনফিওর্ডের উদ্দেশে ছোট এক পেট্রল বাহিনী পাঠিয়ে দিল।

এক ঘণ্টা হাঁটার পর বেলসান্ডের কাছে পৌঁছল গ্রুপ এ। এত দীর্ঘ সময় প্রায় নব্বই পাউন্ড পিঠে করে বয়ে আনার ফলে দু'কাঁধ টনটন্ করছে মাসুদ রানার। অন্যদের অবস্থাও একইরকম, কিন্তু কারও মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। থেমে দাঁড়িয়ে দিক বুঝে নিল রানা।

মাথার ওপর মেঘ নিরেট ছাদের মত ঝুলে আছে। কুয়াশা এ মুহূর্তে নেই, ফলে দিগন্তরেখার মত দূরের উপকূল দেখা যাচ্ছে। চোখে বিনকিউলার লাগাল রানা, খুব সতর্কতার সাথে চোখ বোলাল দিগন্তে।

তারপর আবার এগোল। কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতে উঁচু এক তুষারের ঢিপির আড়াল থেকে একটা সাদা কাঠামো উঠে দাঁড়াল, হাতে সাব-মেশিনগান রেডি। 'নর্দার্ন,' বলল সে।

'স্টার,' স্বস্তির সাথে পাসওয়ার্ড আওড়াল রানা।

ঢিপি ঘুরে এগিয়ে এল কাঠামোটা–পল মিড্ল্যান্ড। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, স্যার।'

কান খাড়া করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে সোহানা। একটু পর আওয়াজটা চিনতে পেরে একটু অস্থির হয়ে উঠল। 'রানা, কপ্টার!'

মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সবাই। আওয়াজ আসছে, কিন্তু মেঘের জন্যে দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। 'টহল দিচ্ছে মনে হয়,' বিড়বিড় করে

মন্তব্য করল ও। পলের দিকে ফিরল। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'নো প্রবলেম।'

'আর সবাইকে দেখছি না কেন?'

'এই খোলা জায়গায় বসে থাকতে গিয়ে নিজেদেরকে ইগলু ছাড়া ব্লাডি এস্কিমো মনে হচ্ছিল বলে পাহাড়ের দিকে গেছে অন্যরা।'

'ঠিক আছে। পথ দেখাও।'

বেশ খানিকটা পথ ঢাল বেয়ে উঠে স্কি দাঁড় করাল মিলার। তার দেখাদেখি অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। রানার আলটিমিটারের কাঁটা দুশো মিটারের কাছে তিরতির করে কাঁপছে। বাকি কয়েক গজ হেঁটে এগোল দল। সামনে টেন্ট শীটের ছাদওয়ালা কয়েকটা লো শেল্টার দেখা গেল। তার একটা থেকে বেরিয়ে এল স্মিথ হাওয়ার্ড। পারকা-র হূডের ভেতরে দাঁত দেখা গেল তার।

'বাকহার্ডকে বোডোর সাথে কথা বলার নির্দেশ দিল রানা। দু'দল মিলিত হতে পেরেছে, খবরটা ওদেরকে জানাবার কথা আছে। বিশ মিনিট একনাগাড়ে চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল বাকহার্ড। হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল।

'পারছি না, স্যার। লাইনে ভীষণ ইন্টারফিয়ারেন্স চলছে। আবার চেষ্টা করে দেখব?'

'না, থাকুক,' মাথা নাড়ল রানা। 'পরে দেখা যাবে। নেক্সট চেক্‌পয়েন্টে। উঠে পড়ো সবাই।'

এবার পথ দেখানোর দায়িত্ব পড়ল পল মিড্‌ল্যান্ডের ওপর। ছয় কিলোমিটার দূরের ভ্যান মিয়েনফিওর্ডের দিকে রওনা হলো দল। বিশাল এক গ্লেশিয়াল ভ্যালি অতিক্রম করে ট্র্যাপারস' হাটের কাছে পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগল। সেই মুহূর্তে আবার কপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল কাছেই কোথাও। এবার ঘন কুয়াশার জন্যে দেখা গেল না ওটাকে।

'হাট কতদূরে?' জানতে চাইল রানা।

'এই তো, পাঁচ-ছয়শো গজ?' পল মিডল্যান্ড বলল। 'এখন খুব সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। রুশ গার্ডরা এখনও ওটার পাহারায় থাকতে পারে।'

বহুগুণ সতর্কতার সাথে এগোল এবার দলটা। কুয়াশা খুব ঘন এখানটায়, পঞ্চাশ গজের ওপাশে কিছু দেখার উপায় নেই। হাটের একশো গজের মধ্যে এসে থামল রানা, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একা চলল পলের সাথে। কিছুদূর যেতে দৃষ্টিসীমা বেড়ে আশি গজে দাঁড়াল, তারপর একশো।

ঘরটা হঠাৎ করেই চোখে পড়ল রানার। ধপধপে সাদার রাজ্যে গাঢ় বাদামী রঙের কাঠামো। উল্টো ভি-এর মত ছাদে পুরু বরফের স্তর। গজ পঞ্চাশেক নিচের এক ভ্যালিতে ওটা। বুকে হেঁটে সন্তর্পণে এগোল এবার ওরা। একটা পাথরের আড়ালে পৌঁছে কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক রাশিয়ান সৈন্য, হাতে এক জোড়া স্কি। ওগুলো পরে নিল সে ঝট্‌পট্‌, উল্টোদিকে রওনা হয়ে গেল। রানা ও পল, যে যার বিনকিউলারের সাহায্যে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। এক সময় ছোট

হতে হতে প্রায় বিন্দুতে পরিণত হলো লোকটা, উঁচু এক বরফের ঢিপির কাছে থামল। আরও দুই বিন্দু ওটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, কাছাকাছি হলো। খুব সম্ভব আলোচনা করছে কিছু নিয়ে।

দশ

মারমানস্ক থেকে অ্যানালাইজড হয়ে আসা এরিয়েল রিকনাইসন্স রিপোর্ট বুধবার শেষ বিকেলে ম্যাকারভের হাতে এল। সে তখন ব্যারেন্টসবার্গে নিজেদের হেলিকপ্টার বেজে। জায়গাটা স্পিটস্‌বার্জেন থেকে একটু দূরে হিরোডেন নামের এক পাহাড়ে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে লংইয়ারবিয়েন এয়ারফিল্ড ও প্লাটা বেরগেটের রাডার, দুটোই দেখা যায় বিনকিউলারে। ইসফিওর্ড রেডিও স্টেশনও কাছে, মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে। ব্যারেন্টসবার্গও নরওয়ের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দু'দেশের সম্পর্ক যখন বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, তখন এখানে ছোট এক কপ্টার বেজ চালু করে মস্কো। '৭৮ সালে নরওয়ের অনুমতির তোয়াক্কা না রেখেই সেটাকে বড় করে তারা।

সব সময় বিশটা কপ্টার মজুত থাকে এখানে। এই ধরনের বিশেষ সিচুয়েশন মোকাবিলার জন্যেই চালু করা হয়েছে এই বেজ।

রিপোর্টটা পড়ল ম্যাকারভ, তারপর দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপের কাছে এসে দাঁড়াল। ওটার বক্তব্য অনুযায়ী লাল টোপর পরানো পিন দিয়ে কিছু কিছু জায়গায় চিহ্ন দিল। 'একটা গ্রুপ নেমেছে উপকূলে,' কাছে দাঁড়ানো এক স্পেৎসনাজ ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল সে। 'এখানে আছে একটা সাপোর্ট শিপ। উপকূল থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরে। এখানে আছে একটা প্লাটুন আকারের রেইডিং পার্টি, উত্তরে যাচ্ছে। আনুমানিক বিশজন। কোন ভেহিকেল নেই।'

'ওরা কমান্ডো-টাইপ রেইড করতে এসেছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্পেৎসনাজ ক্যাপ্টেন।

মাথা দোলাল কর্নেল। 'এক্সপার্টদের সেরকমই ধারণা। এখানে দেখা যাচ্ছে বড় একদল···খুব সম্ভব রেইনডিয়ার, আর এখানে এরা আমাদের বর্ডার পুলিস।'

পাশের রুম থেকে এক তরুণ কমিউনিকেশন ম্যান এসে দাঁড়াল ম্যাকারভের পাশে। 'আমাদের নেভি ওই শিপটাকে ইন্টারসেপ্ট করতে যাচ্ছে, স্যার,' বলল সে স্যালুট করে।

'হুঁম!' ট্র্যাপারস' হাটের স্পেৎসনাজ গার্ডদের সরিয়ে এনে ওখানে বর্ডার পুলিস মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল ম্যাকারভ। স্পেৎসনাজদের অন্য কাজে লাগাতে হবে খুব শীঘ্রি।

ব্রাসেলস্। রাত আটটা।

ভয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সান্ড্রা। ভাবছে, শেষ হয়ে গেছে সে। ভবিষ্যৎ তো গেছেই, এখন স্পাইঙের অভিযোগে বিচারে প্রাণটাও যাবে।

আজকের দিনটা ফিলপটের কাছে জবাবদিহি করেই কেটেছে তার। লোকটা প্রায় নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে এরিক ব্রাউনের সত্যিকার পরিচয়। পুব জার্মান এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিল সে কয়েক বছর আগে। পরে স্টাসিতে যোগ দিয়েছে। তার নামে পশ্চিম জার্মান পুলিসের কাছে যে মোটা ফাইল আছে, তার প্রায় পুরোটার ফ্যাক্স কপিও দেখিয়েছে তাকে ফিলপট। আগেরদিন লন্ডনে বসে ওগুলো সংগ্রহ করেছে সে।

সেই থেকে ভেতরে ভেতরে মরে গেছে সান্ড্রা। সমস্ত স্বপ্ন একদম ধুয়েমুছে গেছে চোখের পানিতে।

ঠিক আটটায় পরপর তিনবার ডোরবেল বেজে উঠতে চোখ মুছে উঠল সে। এরিক এসেছে! ঠিক সময়মতই। দরজা খুলে দিল সান্ড্রা।

'ওহ্, কী একখানা দিন গেল!' ভেতরে ঢুকে বলল এরিক। কোটটা খুলে ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারের দিকে। সে পর্যন্ত পৌঁছল না ওটা, হাতখানেক সামনে মেঝেতে পড়ল, কিন্তু তুলে রাখার গরজ দেখা গেল না তার মধ্যে। চিন্তায় আছে। স্বাভাবিক। ডিয়েট্রিচ জানিয়েছে, মিউনিখ পুলিস তার ব্যাপারে গতকাল থেকে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।

তাই নিয়ে সারাদিন দুশ্চিন্তায় ছিল সে, আর ভাল লাগছে না। এখন খেয়েদেয়ে লম্বা একটা ঘুম...সান্ড্রার ওপর চোখ পড়তে সচকিত হলো। 'কি হয়েছে, ডার্লিং?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সে, চোখাচোখি হতে মাথা নাড়ল, কান্না চাপল অনেক কষ্টে। 'কিছু না।'

'আহা, বলবে তো!' মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল এরিকের। 'এমনিতেই চিন্তায় আছি, তার মধ্যে এসব ন্যাকামো...'

'কিসের এত চিন্তা?' শান্ত গলায় বলল সান্ড্রা। 'কোন চিন্তা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা কথা বলো, ডার্লিং; ডিপিসির মীটিঙের দিন কোথায় রাত কাটিয়েছ তুমি?'

থতমত খেয়ে গেল সে। 'কি!'

'স্টাসির চাকরি করছ কতদিন থেকে?'

এবার স্রেফ হাঁ হয়ে গেল এরিক, আমতা আমতা করতে লাগল।

'মিস্টার ফিলপট!' উঁচু গলায় ডাকল সান্ড্রা। চমকে উঠল এরিক, বেডরূমে কয়েকটা ছায়ার নড়াচড়া দেখে ঘুরেই দৌড় দিল। কিন্তু দরজার বাইরে নতুন চমক অপেক্ষা করছিল—চার বিশালদেহী পুলিস, পুরো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

বেডরূম থেকে বেরিয়ে এলেন জেনারেল অ্যান্ডারসন ও ফিলপট। হাতকড়া পরিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো এরিককে। জানালার পর্দা সরিয়ে পানিভরা চোখে গোটা দৃশ্যটা দেখল সান্ড্রা, তারপর দৃঢ় পায়ে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল। পরদিন দুপুরে বাথটাবে মৃত পাওয়া গেল তাকে।

বাঁ হাতের কব্জির রগ কেটে আত্মহত্যা করেছে মেয়েটা। টক্‌টকে লাল হয়ে আছে বাথটাবের পানি।

জোর করে চোখ মেলল ওয়েসটন, মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল। হাতের তালু দিয়ে হুইলহাউসের ঝাপ্‌সা কাঁচে ডলা দিল সে, একটা অর্ধবৃত্ত এঁকে তার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল। তুষারপাত হচ্ছে।

ঘড়িতে চোখ বুলাতে গিয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল। পাঁচটা বাইশ মিনিট। অর্থাৎ এখন ভোর, এবং বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ নতুন দিন। খুব ধীর গতিতে ভেসে চলেছে নর্দার্ন লাইট, এঞ্জিন অফ, রাডারও অফ। অন্যরা নিচে ঘুমাচ্ছে। নাস্তা খেয়ে জাল ফেলার কথা ওদের।

ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল ওয়েসটন। এখানে তাদের কি কাজ, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল। কাছের ইসফিওর্ড রাডার সাইটের কথা ভাবল। ওখানে রুশদের লং রেঞ্জ রাডার স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে। প্রাথমিক নির্মাণ কাজ শুরুও হয়েছে। বিশাল কারবার। কাজ শেষ হলে জাহাজে করে মারমানস্ক থেকে আসবে রাডারের যন্ত্রপাতি। ওয়েসটন শুনেছে অ্যাসেম্বলিঙের পর জিনিসটার উচ্চতা দাঁড়াবে প্রায় দশতলা এক বিল্ডিংয়ের মত।

জাহাজে আনতে হবে ওটাকে। কারণ ওই রাডারের স্ক্যানার এতই বড় যে কোনমতেই প্লেনে করে আনা সম্ভব নয়। যত বড় প্লেনই হোক।

মুচকে হাসল ওয়েসটন। আসলে কোনদিনই আসবে না ওটা। কেননা মেজর মাসুদ রানার মিশন সফল হওয়া মাত্র গোটা এলাকায় টোটাল ব্লকেড ঘোষণা করতে যাচ্ছে ন্যাটো। আকাশ, সাগর সব সীল করে দেয়া হবে। কোন রুশ জাহাজ বা প্লেন এই এলাকার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

সচকিত হলো ওয়েসটন, ইকোসাউন্ডার অন করল। একটা আঁকাবাঁকা লাইন আঁকা হতে লাগল কাগজে। ত্রিশ ফ্যাদম পানিতে আছে এখন নর্দার্ন লাইট। ম্যাপ দেখল সে। মাছের খোঁজে যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে পলসেনের, সেদিকেই ভেসে চলেছে ট্রলার। রাডার অন করল, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা দুটো চোখে পড়ল–একটা ছোট, একটা বড়। ক্যাথোড স্ক্রীনের বারটার প্রতি চক্করের সাথে একটু একটু করে বড় হচ্ছে ও দুটো।

বিপদ!

রাডারে জাহাজের আকৃতি বোঝা যায়, পরিচয় জানা যায় না। তবে ওয়েসটন নিশ্চিত ওগুলো রুশ, এবং ওদের দিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি সঙ্গীদের ঘুম ভাঙাল ওয়েসটন। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। পালাবার চেষ্টা করলে বিপদ হবে, কাজেই ঠিক হলো যেসব জিনিস দেখলে ব্যাটাদের সন্দেহ হবে, সেগুলো পানিতে ফেলে দেয়া হবে। হুড়োহুড়ি করে তাই করল ওরা।

কিন্তু কাজ পুরোটা শেষ হওয়ার আগেই এসে পড়ল বড় ফোঁটাটা–আস্ত এক রুশ ডেস্ট্রয়ার। শিপটা চোখে পড়ার আগেই ওটার ভেন্টিলেশন মেশিনারির ভুতুড়ে আওয়াজ উঠল। পুরো থেমে থাকলেও সন্দেহ করবে ওরা, তাই তাড়াতাড়ি নর্দার্ন লাইটের এঞ্জিন স্টার্ট দিল পলসেন। সবাই মিলে ফোরডেকে

গুটিয়ে রাখা জাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যেন এখনই ফেলবে। মনে মনে প্রমাদ গুণছে সবাই। ওরা যদি শিপে ওঠে, তাহলে বিপদ। আর যা-ই হোক, অন্তত ফলস্ হোল্ডটা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই।

হোল্ডের ভেতরে হোল্ড ওটা। ওপর থেকে তাকালে কেউ ফাঁকটা ধরতে পারবে না, কিন্তু এঞ্জিন রুমের দরজা খুললেই কম্ম সারা।

'বাল্কহেড ডোর আগলে রাখতে হবে কায়দা করে,' ওয়েসটন বলল। 'ওদেরকে যেতে দেয়া যাবে না ওদিকে।'

'চেষ্টা করব,' পলসেন বলল।

তার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, তুষারের পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল উঁচু একটা কাঠামো, ডেস্ট্রয়ারের বো। ফুল অ্যাস্টার্ন দিয়ে পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। গ্রেটকোট ও পীকড্ হ্যাট পরা এক অফিসার এসে দাঁড়াল ব্রিজে, মুখের সামনে লাউডহেইলার ধরে নরওয়েজিয়ান ভাষায় বলল, 'এঞ্জিন অফ করো!'

'কেন?' পাল্টা চেঁচাল পলসেন।

'আমরা তোমার শিপ চেক্ করব। অফ করো!'

আর কিছু করার নেই, কাজেই এঞ্জিন অফ করে দিল ডিলন। একটা আউটবোর্ডে চড়ে নর্দার্ন লাইটে এসে উঠল রুশরা।

'ক্যাপ্টেন কে?' প্রশ্ন করল সেই অফিসার। এক লেফটেন্যান্ট।

'ও,' পলসেনকে দেখাল ওয়েসটন।

'এই এলাকায় কি করছ তোমরা?' তার দিকে ঘুরে কড়া গলায় জানতে চাইল সে।

'মাছ ধরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি,' পলসেন বলল। 'কেন?'

'সোয়ালবারের পানি সীমায় এসে পড়েছ তোমরা।'

'এসে আবার পড়লাম কোথায়?' বিস্ময় ফুটল পলসেনের চেহারায়। 'এ তো আমারই দেশ।'

চোয়াল দৃঢ় হলো অফিসারের। রেগে উঠছে। 'সব ধরনের শিপকে এই এলাকা থেকে সরে থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে, জানো না? আমরা সার্চ করব এটা।'

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে বাল্কহেড ডোর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো পলসেন, ফলস হোল্ড দেখে ফেলল ব্যাটারা। 'এটা কেন? আছে ওর মধ্যে?'

'কিছু না,' বলল সে। 'বিশ্বাস না হয় চেক্ করে দেখতে পার।'

'তোমাদেরকে তোমাদের শিপসহ অ্যারেস্ট করা হলো,' ঘোষণা করল লেফটেন্যান্ট।

'কি অভিযোগে?'

'সময়মত জানানো হবে।' ওয়াকি-টকির সাহায্যে কারও সাথে কথা বলতে শুরু করল সে।

ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে মাসুদ রানা। পুরো সচেতন নয়। কিন্তু ওরই

মাঝে কয়েকটা চেহারা আবছা ভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি যেন এক ফিশিং ট্রলারে করে ওর বাহিনীর ডিকয় হিসেবে এসেছে মানুষগুলো।

আরেকটু সচেতন হলো ও। চোখ বুজে ভাবল ভার্জিনিয়া রিজের কথা। ওর সন্দেহ ছিল ওদের মিশনের কথা যে করে হোক, রুশদের কানে পৌঁছবেই। সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিতে তৎপর হয়ে উঠবে তারা। তখন এই ডিকয় ওকে সাহায্য করবে। ও হ্যাঁ, নর্দান লাইট ওটার নাম। ওই ট্রলার খোলামেলা এগোবে বলে ওটার ওপরেই সন্দেহ পড়বে রুশদের, তা জেনেই ওটাকে পাঠানো হয়েছে।

রানা তাই চেয়েছে। কারণ তাতে ওর সুবিধে। রুশরা ওদের ওপর নজর রাখবে, সেই ফাঁকে অন্য পথে আসবে ও। প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংস করে দেবে তাদের রাডার। নড়ে উঠল ও, চোখ মেলল ধীরে ধীরে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হলো বুঝি অ্যাভালানশের তলায় জ্যান্ত কবর হয়েছে ওর। এয়ার পকেট আছে বলে বেঁচে আছে অলৌকিক উপায়ে। এখনও মরেনি।

শান্ত থাকো, নিজেকে বলল ও। নোড়ো না, আতঙ্কিত হয়ো না। একই সঙ্গে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল, স্নো হোলটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। কঠিন বরফের এক শেলফের ওপর শুয়ে আছে রানা, স্লীপিং ব্যাগ আর শেলফের মাঝে রয়েছে একটা পাতলা ম্যাট।

ওর দু'ফুট দূরে একই রকম এক শেলফে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সোহানা। দু'জনের মাঝখানে খোঁড়া আছে একটা এবড়োখেবড়ো ট্রেঞ্চ, ঠাণ্ডা বাতাস ধরে রাখার জন্যে। একটা মোমবাতি জ্বলছে, মাথার ওপরের বরফের ছাদ ধীরে ধীরে গলিয়ে একটা খিলানমত তৈরি করছে ওটার সরু শিখা।

শুধু আলো আর উষ্ণতাই দিচ্ছে না ওটা, ছোট একটা গর্ত দিয়ে বাইরে থেকে অক্সিজেনও টেনে আনছে ভেতরে। যতক্ষণ ওটা জ্বলবে, ততক্ষণ দম নেয়ার জন্যে যথেষ্ট অক্সিজেন পাবে রানা-সোহানা।

ঘড়ি দেখল ও। আটটা বেজে আট মিনিট। জিরো এইট জিরো এইট আওয়ার, বৃহস্পতিবার।

উঠতে ইচ্ছে করল না ওর, শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে। গতকালকের কথা ভাবল, ট্র্যাপারস' হাট বেহাত হয়ে যাওয়ায় দলকে অকল্পনীয় কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে কাল। নিরাপদ আরেক আশ্রয়ের খোঁজে পুরো আট ঘণ্টা অমানুষিক কষ্ট করতে হয়েছে। তারপর উপযুক্ত এক ঢাল পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে গর্ত খুঁড়ে। ওদিকে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত বাকহার্ড চেষ্টা চালিয়ে গেছে বোডোর সাথে যোগাযোগ করার, কাজ হয়নি।

জোর করে উঠে পড়ল রানা, স্লীপিং ব্যাগ থেকে বের করল নিজেকে। পা দুটো যাতে জমে শক্ত হয়ে না যায়, সে জন্যে পলিথিনের ব্যাগে রাখা স্নো শূ বের করে পরে নিল। মাথার মধ্যে ঘুরছে ট্র্যাপারস' হাটের কথা। ওটার ভেতরে গভীর গর্ত করে রাখা ছিল বাড়তি খাবার, অ্যামিউনিশন ইত্যাদি। ওগুলো না পাওয়ায় খুব যে ক্ষতি হয়েছে তা নয়, ওসব ছিল অতিরিক্ত।

পাওয়া গেলে প্রয়োজনে সময় বেশি নিয়ে আসল কাজ সারা যেত। কিন্তু এখন সেটা হবে না, এই যা। এখন যা করতে হবে, তা হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

কাজ সেরে সোজা কেটে পড়া। এমনিতেও অবশ্য তা না করে উপায় নেই এখন, ব্লকেড ঘোষণার সময় কাছিয়ে এসেছে। যে-সময় ওগুলো ট্র্যাপারস্ হাটে রাখা হয়, তখন আরও দু'দিন পরে ব্লকেড ঘোষণা করার কথা ছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভালই হয়েছে ওগুলো বেহাত হওয়ায়।

গুহার সাথে ছোট একটা টানেল, টানেলের মাথায় আরেকটা খাড়া টানেল–ভেতরে আসা-যাওয়ার পথ। একটা করে ফোল্ডিং ঢাকনা খাড়া স্কি পোলের মাথায় বসিয়ে বন্ধ করা হয়েছে প্রতিটা গর্তের মুখ। তার আগে ঢাকনার ওপর পুরু করে তুষার বিছিয়ে নিতে হয়েছে যাতে বাইরে থেকে সহজে কারও চোখে না পড়ে ব্যাপারটা। ভেতরে নিজেকে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত লাগছে রানার। মাথা তুললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারী।

মৃদু ঝাঁকি দিয়ে সোহানার ঘুম ভাঙাল ও। 'ওঠো। সকাল হয়ে গেছে।'

বুক পর্যন্ত চেইন নামিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিল ও, পিট্‌পিট্ করে তাকাল। 'ক'টা বাজে?'

'সোয়া আটটা,' বলল রানা। 'উঠে পড়ো, আমি অন্যদের খোঁজ নিয়ে আসছি।'

যে কায়দায় গুহামুখ বন্ধ করা হয়, সেটা রিভার্স করে সন্তর্পণে নাক জাগাল ও। নরম, বড় বড় ফোঁটায় তুষার পড়ছে নাকেমুখে। পড়েই গলে যাচ্ছে। তবে সামনের কয়েকশো গজ স্পষ্ট দেখতে পেল ও। ঢালু হয়ে নেমে গেছে উপত্যকা। সাগর সমতলে দৃষ্টিসীমা কতদূর হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল ও। ভাল হোক, মন্দ হোক, গত আট ঘণ্টা এখানে ভালই ছিল দল। উপত্যকার অনেক উঁচুতে, মেঘের আড়ালে। এখন এই তুষারপাতও সাহায্য করবে ওদের। ট্র্যাক ঢেকে দেবে।

আন্দাজে হাওয়ার্ড স্মিথ ও পলের গুহা খুঁজে বের করল রানা। ওর সাড়া পেয়ে গুহামুখের খানিকটা তুষার ধসিয়ে বেরিয়ে এল ওরা দুজন।

'নাস্তা খেয়ে নাও,' বলল ও। 'পলের সাথে কথা বলে রুট ঠিক করে নাও।'

'রাইট, মেজর,' তৎক্ষণাৎ রাজি সে।

'আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

গুহায় ফিরে রানা দেখল সোহানা পিচ্চি এক গ্যাস বার্নার জ্বেলে তুষার চাপিয়েছে কফি তৈরির জন্যে। 'বাইরে ওয়েদার কেমন, রানা?' ওকে ঢুকতে দেখে জানতে চাইল।

'আমাদের জন্যে মোটামুটি। ওদের জন্যে সুবিধের নয়।'

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে প্রস্তুত হয়ে নিল ওরা, বেরিয়ে পড়ল। 'বাকহার্ড! আরও ওপরে উঠলে রেডিও ইন্টারফিয়ারেন্স কমবে মনে হয়?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, স্যার!' বলল সে। 'খুব একটা কমবে না, এইচ এফ-এ এরকমই থাকবে। তবে ওয়েদার ভাল হলে কমার চান্স আছে। এখন একবার চেষ্টা করে দেখব, স্যার?'

'দেখো।'

একই ফল হলো এবারও, আধঘণ্টা চেষ্টার ফল শূন্য। কোডেড মেসেজ

আগের দিন থেকেই সেটের স্টোরে জমা করা ছিল, অ্যান্টেনা সেট করে শুধু ট্রান্সমিটার বাটন টিপে দিয়ে জবাবের জন্যে অপেক্ষায় থাকল সে। এল না জবাব। ঘিরে দাঁড়ানো সবাইকে দেখে নিল এবার রানা।

'পরিস্থিতি সম্পর্কে কাউকে নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই,' বলল ও। 'তবু বলছি, আমাদের কাছেপিঠেই শত্রুর টহল বাহিনী রয়েছে। ওয়েদারের সুযোগ নিয়ে ওদেরকে ফাঁকি দিতে হবে আমাদের। মনে রাখবে, এই ফাঁকি দেয়াটাও আমাদের রুটিন কাজ।'

একটু বিরতি দিয়ে আরেকবার মুখগুলো দেখে নিল ও। 'কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে কিছুটা সমস্যায় আছি আমরা এ মুহূর্তে। তবে সেটা একেবারেই সাময়িক। আমাদের উইথড্রল কো-অর্ডিনেটের ক্ষেত্রে ওটা কোন সমস্যা হবে না, কেননা তখন আমরা ভিএইচএফ সেট ব্যবহার করব। ঠিক, বাকহার্ড?'

'অল দ্য ওয়ে, স্যার!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'এখন, আগামীকাল সন্ধের মধ্যে ফাইনাল লেইং-আপ পয়েন্টে পৌঁছতে হবে আমাদেরকে, যে কোন মূল্যে। যাতে পরদিন ভোরের মধ্যে রাডার ধ্বংস করে দেয়া যায়। ঠিক সূর্যাস্তের সময় হামলা চালাব আমরা, সত্যি সত্যি সূর্য উঠুক বা না-ই উঠুক। সে জন্যে সময় আছে ছত্রিশ ঘণ্টারও কম। এর মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটা ভ্যালি ও পাস অতিক্রম করতে হবে আমাদেরকে, কাজেই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে যাব আমরা।'

অপেক্ষমাণ মুখগুলোর ওপর নজর বোলাল রানা। এরমধ্যে সবার চেহারায় দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীক্ষ্ণ ছুরির মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাসের কামড়ে হতচ্ছাড়া চেহারা হয়েছে। আর দু'দিন পর মনে হবে পরনের সবকিছু বুঝি জীবনভর পরে আছে ওরা। ঘামের দুর্গন্ধে ভূতও পালাবার পথ খুঁজবে।

'দুর্গম জায়গায় আমাদের চলা একটু ধীর হবে,' আবার শুরু করল ও। 'কয়েক ঘণ্টা পর পর পয়েন্ট ম্যান বদল করব আমি। প্রথম পয়েন্ট ম্যান হবে পল, তারপর মিলার, এইভাবে চলবে। স্মিথ নেভিগেট করবে আপাতত। শত্রুর সাথে দেখা হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না, কিন্তু যদি হয়,' থেমে শ্রাগ করল। 'কি করতে হবে তোমাদের জানা আছে। ব্যাড ভিজিবিলিটির জন্যে পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদেরকে। দুই থেকে তিন মিটারের মধ্যে।'

এরপর কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ও সিগনাল সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করল রানা। সবশেষে প্লাস্টিক কোটেড ম্যাপ তুষারে বিছিয়ে কোন্ রুট ধরে এগোবে, দেখিয়ে দিল।

কাজ শেষ হতে ওটা ভাঁজ করে পারকার ভেতরে, বুকের কাছে রাখল ও। 'বাকহার্ড?'

'নেগেটিভ, স্যার!'

'ওকে, সেট প্যাক করো,' মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও চেপে রাখল রানা। 'আরেকটা কথা, সবাই এক ট্র্যাকের ওপর দিয়ে চলবে। দ্বিতীয় কোন ট্র্যাক চাই না। লেট'স মুভ।'

সাতটা ভৌতিক কাঠামো এক সারিতে [illegible] ফুট পরপর। রানা সবার পিছনে। সোহানা ওর আগে। 'রেডি!' বলল হাওয়াড [illegible]মিথ, স্টিক চালাল। ছিট্‌কে উঠল তুষার, চলতে শুরু করল লাইন।

দেখতে দেখতে মেঘ আর তুষার বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল কাঠামোগুলো।

নরফোক, ভার্জিনিয়া।

SACLANT অ্যাডমিরাল কিঙের অপারেশনস্ রুমে গোটা পুব আটলান্টিক ও আর্কটিক পরিস্থিতি ডিসপ্লে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও নরওয়ের ন্যাটো প্রতিনিধি আছেন সেখানে। আর আছেন বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। একটু উদ্বিগ্ন।

সোয়ালবার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সূত্র মারফত যত খবর পাওয়া গেছে, তার সব একত্রিত করে একদিকের দেয়ালজোড়া বিশাল ম্যাপের গায়ে ছোট ছোট আলোর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা আছে। সোভিয়েত নর্দার্ন ফ্লীটের কোন্ জাহাজ এ মুহূর্তে কোথায় আছে, তা পরিষ্কার দেখানো হয়েছে ওখানে, তার সাথে ন্যাটো টাস্ক ফোর্সের সমস্ত শিপের অবস্থানও।

উত্তরে আর্কটিক আইস প্যাক, পশ্চিমে গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড এবং পুবে সোভিয়েত দ্বীপ নোভাইয়া জেমলাইয়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা আক্ষরিক অর্থে ঘেরাও করে রেখেছে ন্যাটোর টাস্ক ফোর্স। ওদিকে আর্চঅ্যাঞ্জেল বা আরখানজেলস্কোই এবং কোলা পেনিনসুলায় এ মুহূর্তে মজুত ৩৫০ রুশ কমব্যাট প্লেনের মোকাবিলা করার জন্যে আইসল্যান্ডের মার্কিন এয়ারবেস ও স্কটল্যান্ডের আর এ এফ বেসে ৬০০ কমব্যাট প্লেন রেডি।

ওদিকে পল মিডল্যান্ডের সাথে মাসুদ রানার সাক্ষাৎ হয়েছে। ওদের আসল অস্ত্র–ড্রাগন মিসাইল লঞ্চার। ওজন সমস্যার জন্যে ওগুলো ক্লিফোর্ডের দায়িত্বে পাঠিয়েছে রানা। কথা ছিল পথে সমস্যা বুঝলে ওগুলো সাগরে ফেলে দিয়ে রানাকে ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবে সে। তাহলে ও বিকল্প ব্যবস্থা নেবে।

কিন্তু সিগন্যাল পাঠায়নি মেজর। অর্থাৎ ওগুলো নিয়ে নিরাপদেই পৌঁছেছে সে জায়গামত। কিন্তু···ঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল কিং।

নরফোকে এখন বাজে ৮.৫৮ ঘণ্টা, সোয়ালবারে ১৪.৫৮ ঘণ্টা। এখানেও বৃহস্পতিবার সকাল এখন। অ্যাডমিরাল কিং ও ভাইস অ্যাডমিরাল শিপলেক ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্থির। তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ রুশ সাবমেরিন। গ্রীনল্যান্ডের পুবে লিনা ট্রাফ নামে একটা এলাকা আছে সাগরে, পানি অনেক গভীর সেখানে। নরওয়ের উপকূলে ন্যাটোর যে সীবেড সেন্সর পাতা আছে, তার আয়ত্তের বাইরে। অথচ জায়গাটা ন্যাটোর মেইন ফোর্সের পিছনে।

ওই ট্রাফ রুশ সাবমেরিনের নর্থ পোলে যাওয়ার অন্যতম রুট। কিন্তু ওই এলাকা মার্কিন বা ন্যাটোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ওখানে এ মুহূর্তে প্যাক আইসের নিচে কি ধরনের সোভিয়েত সাবমেরিন ওঁৎ পেতে আছে, কেউ জানে না। সেটাই তাঁদের দুশ্চিন্তা আর গভীর উদ্বেগের কারণ।

চুরুট ধরিয়ে ঘন ঘন টানছেন কিং, নজর ম্যাপে, নরওয়ের পাঁচটা ফ্রিগেট ও

তিনটে করভেটের ওপর। ওগুলো আলাদা অবস্থানে রয়েছে। তবে একটা রয়েছে ন্যাটোর স্ট্যান্ডিং ফোর্সের সঙ্গে।

ব্রাসেলসের ঘটনা শুনে হতভম্ব তিনি, রীতিমত অশ্রদ্ধা এসে গেছে ইংরেজ জাতটার ওপরে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, এত সতর্কতা অবলম্বনের পরও দুই পয়সার এক ইংরেজ সেক্রেটারি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানার ক্ল্যান্ডেস্টাইন মিশনের।

যত বিশ্বাসঘাতক সব ইংরেজদের মধ্যেই জন্মায় কেন? তিক্ত মনে ভাবছেন তিনি। ফিলবি, ব্লেক, ব্লান্ট, তারপর এই এক হারামজাদী, ওহ গড়!

'কুত্তীটা ডুবিয়েছে আমাদেরকে,' বন্ধু ও ডেপুটি শিপলেকের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'নর্দার্ন লাইট ধরা পড়েছে। এবার দলবলসহ মাসুদ রানার পালা। ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের। খুব তাড়াতাড়ি।'

তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে একটুও সমস্যা হলো না ভাইস-অ্যাডমিরালের। রাহাত খানকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বললেন, 'এই মুহূর্তে সেটা কি ঠিক হবে? মাসুদ রানার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে আমার। ও শেষ পর্যন্ত...'

'ঝুঁকি নেয়ারও একটা সীমা থাকে, শিপলেক,' বাধা দিয়ে বললেন কিং। 'সব জেনেশুনেও কোন্ ভরসায় এতগুলো মানুষের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকি? মাসুদ রানা কাজ শেষ করে আসতে পারবে, সে ভরসা আমারও আছে। কিন্তু যদি না পারে?'

ঘুরে রাহাত খানকে দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'আমি ভার্জিনিয়া রিজ মিশন ক্যানসেল করতে যাচ্ছি, খান। তোমার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।'

'আমার মনে হয় তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা সাহায্য করছিলাম আর একটা বিশ্বযুদ্ধ যাতে বেধে না যায়, সেজন্যে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বৈরী। ওদেরকে আর এগোতে দেয়া সত্যিই বোকামি হবে।'

ব্যক্তিগত এইডের দিকে ফিরলেন এবার কিং। 'কমান্ডার, যে কোন একটা ডেস্ট্রয়ারকে ওদের তুলে আনার নির্দেশ দিন,' নরওয়েজিয়ান প্রতিনিধির চেহারায় তীব্র হতাশা দেখেও না দেখার ভান করলেন তিনি। দৃঢ় গলায় যোগ করলেন। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এই নির্দেশ দিচ্ছি। আই সেন্ট দেম ইন, অ্যান্ড আই উইল ড্যাম ওয়েল গেট দেম আউট রাইট নাউ।'

রাহাত খানের চেহারা থেকে উদ্বেগের ছায়া দ্রুত কেটে গেল। ওদিকে নরওয়ের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে ঘটল উল্টোটা। ট্রমসোয় বিশটা সী কিং রেডি আছে তাদের, আর আছে চারশো হাইলি ট্রেইনড্ আধা কমান্ডো বাহিনী ফলশ্রিময়েগার।

ভার্জিনিয়া রিজের মিশনের সাফল্যের খবর প্রচার হওয়ামাত্র তাদেরকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে লংইয়ারবিয়েন গিয়ে হাজির হওয়ার কথা ছিল ওগুলোর। রুশরা ভালমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই এয়ারফিল্ড দখল করে নেয়ার কথা ছিল। গেল সব।

'মনে হচ্ছে পাসে পৌঁছে গিয়েছি আমরা,' চাপা, উত্তেজিত গলায় বলল পল মিডল্যান্ড, পয়েন্টম্যান।

প্রায় সবাই টের পেল ব্যাপারটা, কেননা স্কি বাধাহীনভাবে গড়াচ্ছে এখন। আল্টিমিটারে চোখ বোলাল রানা—৭৪০ মিটার। তার মানে পর্বতশ্রেণীর ফাটলের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, যেটা কলেসডালেনের দিকে গেছে।

'বিশ্রাম নেয়া যাক্ কিছুক্ষণ,' বলল রানা। এগিয়ে এসে নরওয়েজিয়ানের পাশে দাঁড়াল। তুষার পড়া থেমে গেছে কয়েক ঘণ্টা আগে। আকাশ উজ্জ্বল, তবে অস্পষ্ট। সূর্যের দেখা নেই।

অবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে আছে প্রত্যেকে। নাক বরাবর সামনে দাঁড়িয়ে আছে বরফমোড়া বিশাল এক পাহাড়। বরফের আড়াল থেকে জায়গায় জায়গায় কালচে, এবড়োখেবড়ো পাথরের দেয়াল বেরিয়ে আছে। পাহাড়টার চুড়ো দেখা যায় না, মেঘের আড়ালে।

'ওটার ওপাশে প্লাটা বেরগেট,' ঘোষণা করল পল মিডল্যান্ড।

যদিও বলার প্রয়োজন ছিল না, ম্যাপ দেখতে দেখতে ওসব মুখস্থ হয়ে গেছে প্রত্যেকের। প্লাটা বেরগেটের সমতল মাথা ছাড়িয়ে আরও দেড় হাজার ফুট উঠে গেছে এপাশের চুড়োটা। পাশেই আছে একটা 'ইউ' আকৃতির গ্লেসিয়ার, যার এক বাহু চলে গেছে নিচের লংইয়ারবিয়েন উপত্যকার দিকে।

'একবার গ্লেসিয়ারে পৌঁছতে পারলে হলো,' পল মিডল্যান্ড বলল। 'আর কোন সমস্যা হবে না।'

অনেক দূরে কপ্টারের আওয়াজ উঠতে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। চেঁচিয়ে উঠল, 'পিছনে চলো সবাই! মেঘের নিচে!'

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল দলটা, তুষার ছিটিয়ে ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল। বেশিদূর যেতে হলো না, গজ পঞ্চাশেক যেতেই আড়াল পাওয়া গেল। বেশি ঘন মেঘ নয়, তবে ওদেরকে আড়াল করে রাখার জন্যে যথেষ্ট।

রাতের জন্যে ওখানেই আশ্রয় নেবে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

লংইয়ারবিয়েন হারবারের এক ইনার মূরিঙে বেঁধে রাখা নর্দার্ন লাইটে এসে উঠল কর্নেল ম্যাকারভ। দুই বর্ডার পুলিস ওটার পাহারায় ছিল, তাকে দেখে কড়া স্যালুট করল লোক দুটো। মাথা নেড়ে কেবিনের দিকে এগোল সে। এখনও ওটার মাস্টে নরওয়ের পতাকা টাঙানো রয়েছে।

তার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল ওয়েসটনের। 'আবার কি?' হাই তুলে নরওয়েজিয়ানে প্রশ্ন করল সে।

'হোল্ড দেখতে এসেছি,' ম্যাকারভ গম্ভীর।

'ওহ্, গড! আবার?' বাঙ্ক থেকে নামল সে। 'আর কতক্ষণ এখানে আটকে রাখা হবে আমাদেরকে?'

কর্নেলের গাম্ভীর্যে ফাটল ধরল। হাসল সে। 'যতক্ষণ না নেভি এসে পৌঁছায়।'

এরকম দুইদিক ধারওয়ালা মন্তব্য শুনে সতর্ক হয়ে গেল ওয়েসটন। কোন নেভির কথা বলছে ব্যাটা? ভাবল সে, নরওয়ের?

তার অবস্থা বুঝতে পেরে আবার হাসল ম্যাকারভ। 'এবার আমার একটা

প্রশ্নের উত্তর দাও, ভায়া। কতজনকে তীরে নামিয়েছ?'

মানুষটার চোখে কৌতুক দেখল ওয়েসটন। ম্যাকারভ যে তার সম্পর্কে সবকিছুই জানে, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার। নাম, র‍্যাঙ্ক, নর্দার্ন লাইটে কোত্থেকে উঠেছে সে, ওটার মালিক কে, কোনকিছুই জানতে বাকি নেই তার। ভার্জিনিয়া রিজ মিশনের দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপারে সে এমন কি শ্রদ্ধাশীলও।

'বলেছি তো আমরা মাছ ধরতে এসেছি,' ওয়েসটন বলল।

'অথচ ধরা পড়েছ অন্য অভিযোগে, তাই না?'

'সেটা যে কি তাই তো এখনও জানতে পারিনি।'

'নেভার মাইন্ড, ক্যাপ্টেন,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাকারভ। 'আমরাও যে-কোন সময় এমন পরিস্থিতিতে পড়তে পারি।'

ফলস হোল্ড পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওকে, থ্যাঙ্কস এনি ওয়ে।'

ওয়েসটনের পেট থেকে গল্পচ্ছলে কিছু বের করা যায় কি না ভাবল কিছুক্ষণ ম্যাকারভ। তারপর বাদ দিল সে চিন্তা। সেটা কখনও হবে না। তার মত একজন কমান্ডো অত সহজে মুখ খোলে না।

একটু পর হোল্ড থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকারভ। সে নিজে কমান্ডো দলের নেতা হলে কোনদিক থেকে প্লাটা বেরগেট আক্রমণ করত, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল।

পরবর্তী ফটোগ্রাফিক রিকনাইসন্স রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকল অধৈর্য চিত্তে।

এগারো

রোজ সকালে নাস্তার সময়ে আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে অসলো রেডিওর খবর মন দিয়ে শোনে অ্যানি। ইসফিওর্ড বা বেলসান্ড স্টেশনের খবর শোনা যায় না রুশদের জ্যামিং-এর কারণে।

এতদিন অসলোর খবর তবু কিছুটা শোনা যেত, গত তিনদিন থেকে তাও আর ঠিকমত শোনা যাচ্ছে না। খবরের মাঝখানে বারবার বাধা দেয়া হয়। অবশ্য আজকের রাতের খবরে বাধা দেয়া হচ্ছে না। বিস্মিত হলো সে ব্যাপারটা লক্ষ করে, মন দিয়ে খবর শুনতে লাগল। এক পাঠিকা একঘেয়ে কণ্ঠে পড়ছে:

'নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ঘোষণা করেছে যে আজ মধ্যরাত থেকে সোয়ালবারের চতুর্দিকে কঠোর নেভাল ব্লকেড ঘোষণা করা হবে। বিচার মন্ত্রণালয় জনসাধারণকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। একই সাথে...' বিচ্ছিরি শোঁ শোঁ করে উঠল রেডিও, আর কিছু শোনা গেল না।

কিন্তু তাতে কিছু আসল-গেল না অ্যানির, 'জাস্টিস মিনিস্ট্রি' শব্দ দুটো শুনতে চাইছিল সে। ওর মধ্যে তার জন্যে বিশেষ এক বার্তা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের গোপন রেডিও সেটের মাধ্যমে মোর্স সঙ্কেত ট্যাপ করতে লাগল সে,

কন্ট্রোলারকে জানিয়ে দিল 'সে শুনছে'।

দু'মিনিট পর সাড়া দিল কন্ট্রোলার: অ্যাকটিভেট উলফহাউন্ড টু অর্গানাইজ সিভিল ডিস্টার্বেন্স। টপ প্রায়োরিটি কীপ রাশিয়ান পুলিস অকুপাইড নেক্সট ৪৮ আওয়ারস।

কাগজটা পুড়িয়ে ছাই কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দিল মেয়েটা, তখনই বেরিয়ে পড়ল উলফহাউন্ডের গলার শেকল খুলে দিতে।

গত দু'সপ্তাহ থেকে সুকৌশলে স্থানীয় নরওয়েজিয়ান খনি শ্রমিক নেতাদের সাথে গোপন বৈঠক চালিয়ে আসছে সে। দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে তাদের সাহায্য যে-কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হবে, জানানো আছে সবাইকে।

তারাও প্রস্তুত।

নাস্তা খাওয়ার সময় রেইডিং পার্টিকে কি ভাবে ফাঁদে ফেলা যায়, তাই নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামাতে শুরু করল ম্যাকারভ। ওটা কোনও অবজার্ভেশন পার্টি নয়তো? হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এলো, ধরা যাক্ তা-ই, কিন্তু কি দেখতে এসেছে তারা?

ফিরে গিয়ে কিসের ওপর রিপোর্ট করবে? এয়ারফিল্ড? নাকি রাডার সম্পর্কে? না, তার কোন যুক্তি নেই। আমেরিকান স্যাটেলাইটের কল্যাণে সে খবর অনেক আগেই জানা হয়ে গেছে সবার। অর্থাৎ অবজার্ভেশন নয়, ডেসট্রাকশনই ওদের উদ্দেশ্য। কোন সন্দেহ নেই।

এয়ার ডিফেন্স কমান্ড থেকে রাতে আসা কিছু ফটোগ্রাফিক ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্টে চোখ বোলাল সে। কিছু হীট সোর্সের আভাস আছে তাতে। ওগুলো কি, বাজে ওয়েদারের জন্যে সনাক্ত করতে পারেনি তাদের স্যাটেলাইট। সে কাজ এখন ম্যাকারভকে করতে হবে।

হীট সোর্সের একটা উৎস, একদল মানুষ বা হরিণ যাই হোক, পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে উত্তর পুবদিকে যাচ্ছিল গতকাল সন্ধে পর্যন্ত। হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছে দলটা। পরে যত ইনফ্রারেড ছবি তোলা হয়েছে, কোনটাতেই নেই সোর্সগুলো। কেন? বাই দ্য ওয়ে, হরিণ এত চালাক প্রাণী হলো কবে থেকে? দলটার চলার গতি, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, কোনটাই মেলে না হরিণের সাথে। পোলার বেয়ারের সাথেও মেলে না। তাহলে?

ম্যাপে দলটার রুট পজিশন চিহ্নিত করল সে, একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল–উপকূল থেকে কলেসডালেনের দিকে গেছে সোর্সগুলো। সবার অলক্ষে লংইয়ারবিয়েন পৌঁছতে হলে ম্যাকারভ নিজেও ওই রুট বেছে নিত।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে কলেসডালেন থেকে চক্কর মেরে আসার সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল। বিশ মিনিট পর তাকে এবং এক কুড়ি ফাইটিং পেট্রল নিয়ে আকাশে উঠল প্রকাণ্ড একটা এমআই-সিক্স। কেবিনে গাদাগাদি করে বসে আছে লোকগুলো, তাদের অস্ত্রপাতি ঢিপির মত উঁচু হয়ে আছে ফ্লোরে। কর্নেল বসেছে সামনে।

উপকূলরেখা ধরে মিনিটে মাত্র দুই কিলোমিটার গতিতে কলেসডালেনের দিকে উড়ে চলল এমআই-সিক্স। একটু পর প্রায়-পরিত্যক্ত কোলেসবুকতা জেটি

ও কিছু পরিত্যক্ত মাইন পেরিয়ে এল। কয়েকজন বর্ডার পুলিস মুখ তুলে হাত নাড়ল ওটার উদ্দেশে।

নিচে কুয়াশা নেই এ মুহূর্তে, দেখতে পেল ম্যাকারভ। বাতাস আছে বেশ। পাহাড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আসা জোর বাতাসে দুলে উঠছে কপ্টার, ঝাঁকি খাচ্ছে। সামনের তুষারমোড়া পাহাড়ের মাথা ঢাকা পড়ে আছে মেঘের আড়ালে। ওদিকে ঘন তুষারপাত চলছে।

ম্যাপে নজর বুলিয়ে নিল পাইলট। বলল, 'আর পাঁচ মিনিট, কমরেড পলকভনিক।'

জায়গামত পৌঁছে পিচ্ কন্ট্রোল নিজের দিকে টানল লোকটা, গতি পড়ে গেল কপ্টারের। লেজের দিক খানিকটা নিচু হয়ে গেল। কো-পাইলট নিচের তুষারে চোখ বোলাতে লাগল সতর্কতার সাথে। ম্যাকারভ আর সে একই মুহূর্তে দেখতে পেল ট্রেইলটা। ঠিক ওটার ওপরে পৌঁছে ভেসে থাকল কপ্টার, রোটরের ডাউনওয়াশে ট্রেইল যাতে মুছে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে পাইলট।

বিনকিউলারের সাহায্যে ট্রেইলটা খুব ভাল করে দেখল ম্যাকারভ, একটাই ট্র্যাক, তবে বেশ গভীর। এবং চওড়ায়ও বেশি। একজন মানুষের ট্র্যাক কখনও এত গভীর আর চওড়া হতে পারে না। ধীরে ধীরে কঠিন হাসি ফুটল কর্নেল ম্যাকারভের মুখে।

'ট্র্যাক ফলো করো,' পাইলটকে নির্দেশ দিল সে। যতদূর সম্ভব ওটাকে অনুসরণ করতে চায় সে, তাতে পেট্রল বাহিনীর কষ্ট কমবে।

কিন্তু হলো না, আধ মিনিট যেতে না যেতে ভিজিবিলিটি ঝপ্ করে পঞ্চাশ মিটারে নেমে এল। শূন্যে কপ্টার দাঁড় করিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো পাইলট। 'আর যাচ্ছে না। কমরেড পলকভনিক। ল্যান্ড করব?'

সামনে তাকিয়ে আছে ম্যাকারভ, ট্রেইলটা হারিয়ে গেছে সামনের হিম-ঝঞ্ঝার আড়ালে। এখন যদি লোকগুলোকে এখানে নামিয়ে দেয়া হয়, ঝড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেখা পাওয়ার আশা নেই, ভাবছে সে। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত লোকগুলোর সার্চ প্যাটার্ন ইচ্ছে থাকলেও পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হবে না।

এদিকে ঝড়ের কারণে অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুর ট্রেইল মুছে যাবে। মহাসমস্যা! কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না ম্যাকারভের। এই যুদ্ধে তাকে জিততে হবে। জিততেই হবে।

'ল্যান্ড!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। কেবিনে চলে এল। পেট্রল বাহিনীর অফিসারকে নির্দেশ দিতে লাগল দ্রুতকণ্ঠে। 'ট্রেইল অনুসরণ করো। যদি শত্রুর দেখা পাও, পরবর্তী নির্দেশের জন্যে আমার সাথে যোগাযোগ করবে রেডিওতে। শত্রুকে জ্যান্ত ধরতে হবে, ইউ হিয়ার? সবক'টাকে জ্যান্ত চাই আমি।'

'রাইট, কমরেড পলকভনিক!' মাথা ঝাঁকাল অফিসার।

'আমি প্লাটা বেরগেটে ফিরে যাচ্ছি,' বলল কর্নেল। 'যদি ব্যাটাদের দেখা পাও, ধাওয়া করে মালভূমিতে নিয়ে আসবে, তাহলে আমাদের দুই দলের মধ্যে আটকা পড়বে ওরা। ওকে?'

'ওকে!' ঝট্‌পট্ দরজা খুলে নেমে পড়ল লোকটা। হুঙ্কার ছাড়ল সঙ্গীদের

উদ্দেশে, 'আউট!'

'গুড লাক!' অফিসারের কাঁধে চাপড় লাগাল ম্যাকারভ। ওরা রেড আর্মির এলিট ফোর্সের বিশেষ দল, ভাবল সে। ওরা যদি কাজটা করতে না পারে তাহলে কেউ পারবে না।

ব্যারেন্টসবার্গ ঘাঁটিতে ফিরতেই কবীর চৌধুরীর একটা মেসেজ পেল সে। তাতে শীঘ্রি এক প্লাটুন স্পেৎসনাজ লংইয়ারবিয়েনে পাঠানোর নির্দেশ আছে।

'কেন?' কমিউনিকেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করল কর্নেল। 'কি জন্যে...'

'নরওয়েজিয়ান খনি শ্রমিকরা দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে শহরে, কমরেড পলকভনিক্। বর্ডার পুলিস সামাল দিতে পারছে না।'

খবরটা শোনামাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল সে, কুঁকড়ে গেল ভেতরে ভেতরে। রায়ট! খনি শ্রমিকরা...তা-ও ঠিক এমন সময়? ওদিকে ফিশিং বোট, রেইডিং পার্টি, এদিকে রায়ট, কি ঘটছে এসব?

যদিও নির্দেশ পালন করতে দেরি করল না সে, সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশজন স্পেৎসনাজ পাঠিয়ে দিল লংইয়ারবিয়েনে। ১২০ জন ছিল ওরা, তার মধ্যে ৩০ জন এখানকার বেসের পাহারায় রয়েছে। পাহাড়ে শত্রুর খোঁজে লেগে আছে ৩০ জন। বাকি ছিল ৫০ জন; তার থেকেও ৩০ জনকে হারাতে হলো। এখন যে ক'জন আছে, তাদের সাহায্যে রাডার রক্ষা করতে হবে তাকে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই।

নর্দার্ন লাইট যেখানে বাঁধা, সেখান থেকে শহরের হই-চই শোনা গেলেও দেখা যায় না কিছু। অনেকগুলো উঁচু শেড আর ওয়্যারহাউস দৃষ্টিপথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

জনতার ভাঙচুর, চিৎকার ও রুশ বর্ডার পুলিসের গুলির শব্দ শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ডিলন ওয়েসটন ও ক্লিফোর্ড। একই অবস্থা ট্রলারের সশস্ত্র দুই গার্ডেরও।

'কি ঘটছে শহরে?' পলসেন জিজ্ঞেস করল হোল্ড থেকে বেরিয়ে। চোখ ফোলা তার, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। 'রায়ট বেধেছে মনে হচ্ছে?'

'নিয়েত্!' তেড়ে এল গার্ডদের একজন, ঝট্ করে রাইফেল তুলল তাকে লক্ষ্য করে। 'গো ব্যাক, ইন দ্য কেবিন। অল!'

পিছিয়ে এসে হুইল হাউসে বসল চার কমান্ডো। 'এবার কেটে পড়ার সময় হয়েছে,' বলল ওয়েসটন।

হুইল হাউসের দরজা ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছে যাতে শহরের কোলাহল শোনা যায়। কান পেতে আছে ওরা। আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে। দুই গার্ড অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ভয় পেয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। কি যেন পরামর্শ করল লোক দুটো, একজন মাথা দুলিয়ে হুইল হাউসের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরেই ছুটল শহরের দিকে। অবস্থা দেখতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতে ক্লিফোর্ডের দিকে ফিরল ওয়েসটন। 'ওই ব্যাটাকে কায়দা করে এখানে নিয়ে আসতে পারলে হত,' বলে হাসল। 'তুমি

অসুস্থ, ক্রেইগ। কেবিনে গিয়ে জোরে চেঁচাও। পলসেন, ওকে সাহায্যের ভান করো।'

এক মিনিট পর হুড়মুড় করে হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এল ওয়েসটন। গার্ডের উদ্দেশে চেঁচাল, 'কমরেড, এদিকে আসুন! তাড়াতাড়ি!'

ঘুরে তাকাল লোকটা, কিন্তু নড়ল না।

'কমরেড!' আবার ডাকল সে জরুরী ভঙ্গিতে। মুখস্থ কিছু রুশ বুলি ঝেড়ে দিল। 'আসুন! জলদি!'

'দা?'

'এদিকে আসুন! আমাদের এক সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হসপিটালে নিতে হবে তাকে।'

আর কিছু না বুঝলেও 'হসপিটাল' শব্দটা ঠিকই বুঝল সে, অপ্রশস্ত কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে এগিয়ে এল। তাকে পথ করে দেয়ার জন্যে সরে দাঁড়াল ওয়েসটন, হাত তুলে কেবিন দেখাল। উঁকি দিল গার্ড, ক্লিফোর্ডকে ব্যান্ডেজ বাঁধা পা ধরে আছাড়পাছাড় করতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। পলসেন 'ধরে রাখতে' পারছে না তাকে।

নড়ল না গার্ড, কেবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল। তার দিকে এগোল ওয়েসটন, একহাত দেহের পিছনে, একটা রেঞ্চ ধরা আছে মুঠোয়।

পাঁচ মিনিট পর রুশ বর্ডার পুলিসের ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় কেবিন থেকে বের হলো ওয়েসটন, হাতে রাইফেল। ওটার নল পলসেনের পেটে ঠেকিয়ে হম্বিতম্বি করতে দেখা গেল তাকে, মনে হলো ট্রলার ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

একটু পর ঘাট ছেড়ে পিছিয়ে এল নর্দার্ন লাইট, ঘুরে সর্বোচ্চ এগারো নট্ গতিতে ছুটল খোলা সাগরের দিকে।

খাড়া দেয়াল বেয়ে বড়সড় একেকটা গিরগিটির মত ওপরে উঠে চলেছে ভার্জিনিয়া রিজের সদস্যরা। যত উঠছে, বাতাসের মাতমও বাড়ছে ততই।

এ মুহূর্তে দলের নেতৃত্বে রয়েছে মাসুদ রানা। বাতাসের যত চাপই থাক, তা নিয়ে খুব একটা ভাবছে না ও। কেননা পিছন থেকে আসছে বাতাস, তাতে বরং সুবিধেই হচ্ছে সবার, অল্প পরিশ্রমে উঠে যেতে পারছে।

অবশ্য চূড়োয় কি অবস্থা হবে ও জানে না। কেউ জানে না। রিজ অতিক্রম করে চার কিলোমিটার দীর্ঘ গ্লেসিয়ার পাড়ি দিতে হবে দলকে, তারপর লংইয়ারবিয়েন। ওদিকের উপত্যকা হবে ভিন্ন প্রকৃতির, হয়তো বাতাসও হবে ভিন্ন রকম।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে দল। থেকে থেকে পারকায়, হুডে প্রচণ্ড টান পড়ছে। হুডের নিচে উলের ব্যানডানা দিয়ে নাকমুখ আচ্ছামত বেঁধে নিয়েছে সবাই, চোখে গগলস। তারপরও পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসা বাতাসের চাপে থেকে থেকে দম আটকে আসছে। একটু পর পর থামছে রানা, পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে ছায়াগুলো ওকে অনুসরণ করছে কি না ঠিকমত।

ওর পিছনে রয়েছে সোহানা, রানাকে থেমে পড়তে দেখলে ও-ও থামছে, নিজের পিছনেরজনকে দেখে নিচ্ছে, সে দেখছে তার পিছনেরজন আছে কি না, এই ভাবে চলছে দলটা। এখানে তাপমাত্রা মাইনাস আটাশ ডিগ্রী। ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হওয়ার প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে এই আবহাওয়ায়।

এত ঠাণ্ডায় খুব অভিজ্ঞ পাহাড়ীও জায়গা ছেড়ে নড়ে না, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। কিন্তু ওদের সে উপায় নেই। জায়গামত পৌঁছার তাড়া আছে। আল্টিমিটারে চোখ বোলাল ও–উনিশশো ফুট। আরও অন্তত আড়াইশো ফুট উঠতে হবে।

পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে রানা, বগলের কাছে বিচ্ছিরিরকম চট্‌চটে অনুভূতি। ঘাম। কুঁচকির কাছেও একই অনুভূতি। বেশি ঘামলে বিপদ, জমে বরফ হয়ে যাবে থামলেই। অন্যদের কি অবস্থা নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছে রানা, তাই আর দেরি না করে এক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম ঘোষণা করল।

পাহাড়ের বড় বড় ফাটল, আড়াল খুঁজে নিয়ে যে যার টেন্ট শীট মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল সবাই। বাতাসের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তিগত প্যাক ও ইকুইপমেন্টের আড়ালে বসল। রানা ও সোহানা বসল কাছাকাছি।

ওকে উসখুস করতে দেখে সোহানা মাথা ঝাঁকাল। চেঁচিয়ে বলল, 'কি হয়েছে?'

'ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের সাড়া পাচ্ছি না।'

'কখন থেকে?' উদ্বেগ ফুটল ওর চেহারায়।

'বেশিক্ষণ হয়নি,' মিথ্যে বলল রানা। সত্যি বললে সোহানা ঘাবড়ে গিয়ে এখনই পানি ফুটাতে লেগে যাবে। রানাকে বাধ্য করবে তার মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকতে।

'একদম সাড়া নেই?' সোহানা নাছোড়বান্দা।

'একটু একটু আছে,' আবারও মিথ্যে বলতে হলো ওকে। কেননা এখনই কিছু করতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কয়েক ঘণ্টা পর ভালয় ভালয় শেষ স্টপেজে পৌঁছতে পারলে পা নিয়ে মাথা ঘামাবে রানা, এখন নয়। 'তোমার কি অবস্থা? কোন সমস্যা নেই তো?'

মাথা নাড়ল ও–নেই।

সোহানার অগোচরে আঙুলটা নাড়ার কসরত চালিয়ে যেতে লাগল ও, কাজ হচ্ছে না। একদম সাড়া নেই। কোন অনুভূতিই নেই ওটায়। গগলস পরিষ্কার করে আবার চোখে দিল রানা।

ঝড় থামার অপেক্ষায় থাকল। লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছে আর দেরি নেই, থেমে যাবে যে-কোন সময়।

হিসেবে গোলমাল হয়ে গেলে অথবা গুরুতর কোন সমস্যা দেখা দিলে ঘাবড়ে যাবে, এমন বান্দাই নয় কবীর চৌধুরী। বরং রেগে আছে সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনে দাঁড়ানো বর্ডার পুলিসের লেফটেন্যান্টের দিকে। খাম্বার মত দাঁড়িয়ে আছে সে, ভেতরে ভেতরে ঘামছে ভয়ে।

'আপনি জনতার ওপর গুলি চালাবার অর্ডার দিয়েছেন?' ভরাট গলায় প্রশ্ন করল সে। 'তাদের মাথার ওপর দিয়ে নয়?'

'ওরা…ওরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল, স্যার!' কোনমতে চিঁ-চিঁ করে বলল লেফটেন্যান্ট। 'সামাল দেয়া যাচ্ছিল না। প্রথমদিকে ফাঁকা গুলিই করেছিলাম, স্যার!'

'আপনি বুঝতে পারছেন কত বড় ক্ষতি করে বসেছেন আপনি নিজ দেশের আন্তর্জাতিক ইমেজের?' ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'কতজন মারা গেছে?'

'তিনজন, স্যার।'

কিছু সময় ভাবল সে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'এখন যান, আপনার কি ব্যবস্থা করা যায় পরে ভেবে দেখব আমি।'

সতেরোজন রুশ বর্ডার পুলিস আহত হয়েছে রায়টে, লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে যেতে সামনে পড়ে থাকা রিপোর্টটা দেখল সে। তার মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। বাঁচবে কি না সন্দেহ। কয়েকটা রুশ গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নরওয়েজিয়ান শ্রমিকরা, হামলা চালিয়েছে রুশ মাইনেও। এখন পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আবার…

উঠে পড়ল সে। আরেক আপাত মারাত্মক সমস্যার কথা মনে পড়েছে, নর্দার্ন লাইট পালিয়ে গেছে। অবশ্য ওদের সেরকমই ধারণা। কিন্তু কবীর চৌধুরী জানে তা সত্যি নয়। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে আবার ওটাকে তাড়া করে ধরে ফেলতে পারে রুশ নেভি। কিন্তু সে তা চায় না।

তার ধারণা ওটায় করেই ফিরে যাবে আমেরিকান রেইডিং পার্টি, অন্তত চেষ্টা করবে। দলের সবাই উঠুক আগে, তারপর সবাইকে একসঙ্গে আটক করবে সে। ম্যাকারভ নিশ্চয়ই এতক্ষণে দলটার অবস্থান সনাক্ত করতে পেরেছে, তাড়া করে বেড়াচ্ছে ব্যাটাদের।

কমান্ডো বাহিনীর পালাবার দৃশ্য কেমন হতে পারে, অনুমান করতে গিয়ে হাসি পেল কবীর চৌধুরীর। নিশ্চয়ই ইঁদুরের মত…

বারো

দুপুরের দিকে বাতাসের গতি কমল, তুষারপাতের পরিমাণও। ভিজিবিলিটি বেড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটারে দাঁড়াল। যে অসহ্য পরিবেশ, তাতে হাওয়ার্ড স্মিথ তার নিত্য শেভ করার রুটিন ভুলে গেছে। কয়েকদিন শেভ করার সুযোগ না পাওয়ায় গজিয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ির কাছে অন্যদেরও কৃতজ্ঞ মনে হলো। দাড়ির জন্যে ঠাণ্ডা সামান্য হলেও কম লাগে।

মিসাইলের বিযুক্ত অংশগুলো হাত বদলের নির্দেশ দিল মাসুদ রানা, ঠাণ্ডায় প্রায় জমাট বেঁধে যাওয়া হাত-পা নেড়ে এই কাজটুকু শেষ করতেই অনেক সময়

লাগল ওদের। তারপর আবার শুরু হলো চলা। এক সময় চুড়োয় উঠে এল দল। থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকে গ্লেসিয়ারের বিস্তৃতি দেখছে। তাদের এবং গ্লেসিয়ারের প্রান্তের মাঝে বিশাল এক ফাটল–হাঁ করে আছে।

'নিচের দিকে বরফ গলা শুরু হয়ে গেছে,' মিডল্যান্ড বলল।

'সে তো বুঝলাম,' ত্রেভিনস্কি বলল অধৈর্য কণ্ঠে। 'কিন্তু এখন এই ফাটল পার হওয়ার উপায় কি? আগামী গ্রীষ্মের আগে রাস্তা পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না।'

'টেক ইট ইজি,' রানা বলল। 'একটু নিচে নেমে দেখা যাক পাওয়া যায় কি না।'

বেশ খানিকটা নামতে পাওয়া গেল রাস্তা। তুষারমোড়া কঠিন বরফ আর পাথরের মধ্যে চার ফুট ফাঁক সেখানে। ব্যাকপ্যাক আর স্কি খুলে ওপারের উদ্দেশে লাফ দিল ডেপুটি হাওয়ার্ড স্মিথ। কিন্তু পুরো যেতে পারল না, কিনারার নরম তুষারে পা পিছলে গেল তার। তাতে অবশ্য সমস্যা হলো না, দু'হাতে কিনারা আঁকড়ে ধরে ওপরে তুলে ফেলল সে নিজেকে। কঠিন বরফে একটা স্পাইক গেঁথে সেফটি লাইন দিয়ে নিজেকে বাঁধল তার সাথে।

'দুটো করে স্কি বাঁধো মজবুত করে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ব্রিজ বানাও।'

তাই করা হলো, দুটো সরু, সমান্তরাল প্ল্যাঙ্কের মত দেখতে হলো ব্রিজ। একজন একজন করে চার হাত-পায়ে ভর করে পার হতে লাগল দলটা। সবশেষে এল মেডিক জনসনের পালা। পিঠের বোঝাটা অন্যদের তুলনায় বেশ বড় তার। সতর্কতার সাথে ওপারে পৌঁছল সে, এক হাত বাড়িয়ে গ্লেসিয়ারের দেয়াল ছুঁয়েছে, এমন সময় একদিকের স্কির বাঁধন সরে গেল জায়গা থেকে। বেশি নয়, কিন্তু তার ভারসাম্য টলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

কাত হয়ে গেল স্কি, কয়েক মুহূর্ত অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঝুলে থাকল জনসন, তারপর ভারসাম্য হারিয়ে ঝপ্ করে ঝুলে পড়ল অতল ফাটলের মধ্যে। অন্য স্কিটাকে ধরার জন্যে শেষ মুহূর্তে হাত বাড়িয়েছিল সে, কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করে বসায় ব্যর্থ হলো। কোমরে বাঁধা সেফটি লাইনে ঝুলতে লাগল। টান পড়ায় কিনারার তুষার কেটে বসে যেতে লাগল লাইন, ওপারে দাঁড়ানো বাকি সবাই টেনে ধরে রেখেছে ওটা।

'নড়বে না!' চিৎকার করে বলল রানা। পিঠের বোঝা ফেলে এগিয়ে এল সামনে। 'ভয় নেই। আমরা টেনে তুলছি তোমাকে। দড়িতে টান পড়লে কিনারা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা কোরো। ওকে?'

পাথুরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির রাখল জনসন, অজান্তেই এক নজর নিচে তাকিয়ে শিউরে উঠল। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। মুখ তুলে রানাকে দেখল, ভরসা খুঁজছে।

'ঘাবড়িয়ো না,' রানা বলল। 'আমরা আছি তোমার সাথে। রেডি? স্মিথ, পুল্!' ওর ভয় ছিল জনসনের ভার সইতে পারবে না লাইন, ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না, সতর্কতার সাথে লোকটাকে তুলে আনল ওরা। ততক্ষণে ঘেমে উঠেছে সবাই।

'সরি, ফেলার্স্,' হাঁটু গেড়ে বসে বলল জনসন। হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

'যে কারও বেলায় ঘটতে পারত,' রানা বলল। 'লেট'স মুভ।'

'মেজর!' পিছন থেকে ডাকল মেডিক্যাল কর্পসম্যান। 'মনে হচ্ছে কব্জি ভেঙে গেছে, স্যার।' চোখমুখ বিকৃত করে বাঁ হাত তুলে দেখাল। 'কেউ একজন ব্যান্ডেজ করে দেবে, প্লীজ? ভাগ্য ভাল ডান হাত ভাঙেনি।'

মিলার এগিয়ে গেল তার দিকে, ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করে গ্লাভস খুলে পরীক্ষা করে দেখল তার কব্জি। একটা হাড় সত্যিই ভেঙেছে বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল। তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল বাকহার্ডের সাহায্যে। 'দেয়ার ইউ আর, মেট,' গ্লাভস পরে নিয়ে বলল।

'থ্যাঙ্কস, সার্জেন্ট,' রানা বলল। মনে মনে প্রার্থনা করল এটাই যেন শেষ দুর্ঘটনা হয়। ভরসার কথা যে অল্পের ওপর দিয়ে গেছে ধাক্কাটা, ডান হাত ভাঙেনি জনসনের। তাহলে দলের জন্যে বোঝা হয়ে উঠত লোকটা। এখন থেকে রেডিও অপারেট করবে ও, ঠিক করল রানা, মেডিকের দায়িত্ব পালন করবে বাকহার্ড।

মাঝারি গতিতে নামতে শুরু করল দল। বাতাস উল্টোদিক থেকে বইছে এখন। তুষার ঝড় থেমে গেছে। গ্লেসিয়ারের শেষ মাথায় পৌঁছে থামল রানা, ফাটল এখানে মাত্র দুই ফুট চওড়া। মিডল্যান্ডকে অনুসরণ করে রিজের কিনারা ধরে এগোল দল–দ্বিগুণ সতর্কতার সাথে।

আঠারোশো ফুট নিচে রয়েছে লংইয়ারবিয়েন, চোখের আড়ালে। রাডার থেকে খুব সম্ভব ছয় মাইল দূরে রয়েছে এখন দলটা।

ঘড়িতে বাজে ১৬০০ ঘণ্টা।

ভার্জিনিয়া রিজের অপারেশন শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

ক্যামোফ্লেজ পেইন্ট করা চার চাকার এক ভ্যানের ওপর রয়েছে সদ্য বসানো রুশ আর্লি ওয়ার্নিং রাডারটা। ভ্যানের সাইডে একটা দরজা, ওপরে ডিম আকৃতির একজোড়া বিরাট ডিশ এরিয়াল। একটা রয়েছে সামনের দিকে, অনেকটা বুলডোজার ব্লেডের মত দেখতে। ওটার কাজ ইনকামিং এয়ারক্র্যাফট সনাক্ত করা। অন্যটা ছাদের মাঝখানে ঘুরছে ধীরগতিতে। মিনিটে পনেরোবার ঘোরে ওটা। গুঞ্জন করছে মোটর।

দ্বিতীয় এরিয়েলের ওপরে আছে একটা দীর্ঘ হরাইজন্টাল বার। সামনের মেইন এরিয়েল যখন কোন এয়ারক্র্যাফট পিক করে, তখন এই বার 'ইন্টারোগেটিং' সঙ্কেত ছুঁড়ে দেয় বাতাসে। এই ইন্টারোগেটিঙের জবাব দেয়ার জন্যে রুশ প্লেনে ট্রান্সপন্ডার নামে এক ধরনের ডিভাইস আছে। ক্র্যাফট যদি নিজেদের হয়, তাহলে সাথে সাথে সঙ্কেতের জবাব দেবে ওটা। আর যদি তা না আসে, অথবা ভুল জবাব আসে, তাহলে ওটাকে শত্রুপক্ষের ধরে নেয়া হয়। এই সিস্টেমের নাম 'আইডেন্টিফিকেশন ফ্রেন্ড অর এনিমি'।

কপ্টারে বেঁধে প্লাটা বেরগেটে তুলে আনা হয়েছে ভ্যানটা। তার আগে ওটার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্যে আনা হয়েছে টনকে টন মাটি আর নুড়ি। রাডার

স্থাপনের কাজ তাড়াতাড়ি সারার জন্যে। নইলে বরফ পুরো না গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত মস্কোকে। কাজেই আপাতত কাজ চালাবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভ্যান থেকে এক সেট কেবল চলে গেছে কাছেই গুঞ্জন করতে থাকা মোবাইল জেনারেটরের দিকে, আরেক সেট চলে গেছে অনেক নিচের লংইয়ারবিয়েন এয়ার ফিল্ডের কন্ট্রোল সেন্টারে। ওগুলোর কাজ ডাটা ট্রান্সমিট করা। ভ্যানের কাছে রয়েছে পুরু বরফের তৈরি একটা ঘর, টেকনিশিয়ানদের ব্যবহারের জন্যে। দুজন টেকনিশিয়ান থাকে ওটায়, রাডারের অটোম্যাটিক অপারেশন মনিটর করে। প্রয়োজনে সরাসরি কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে কথা বলতে পারে তারা।

শত্রু এলে কোনদিক থেকে আসবে, আগেই তা অনুমান করে রেখেছে ম্যাকারভ। তাই ওদিককার দেয়াল বেশি মজবুত করে তুলেছে। দুই মিটার চওড়া বরফের ব্লক দিয়ে তৈরি ওটা।

সাধারণ স্মল আর্মসের গুলি ঠেকিয়ে দিতে যথেষ্ট। তাছাড়া হাটের ভেতরে আগে থেকে অনেক কিছু মজুতও করেছে ম্যাকারভ–প্রচুর গুলি, জ্বালানি, খাবার, একটা শক্তিশালী ৮২ এম এম মর্টার ও গোটা কয়েক ম্যান-পোর্টেবল স্ট্রেলা অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইল। আরও খুশির কথা, এস্টাবলিশমেন্টের পাহারায় যে স্পেৎসনাজ দলটি রয়েছে, তাদের সাথে আছে নতুন ৫.৪৫ এমএম একে-৭৪ অ্যাসল্ট রাইফেল। পুরনো একে-৪.৭ থেকে অনেক উন্নতমানের রাইফেল ওটা। হালকা। কাঁধে ঝুলিয়ে রেখে চলার ওপরই গুলি ছোঁড়া যায়। চল্লিশ রাউন্ড গুলি আঁটে ওটার প্লাস্টিক-ম্যাগাজিনে।

মিয়েনফিওর্ডের মিলিটারি অ্যাকটিভিটির খবরে বোঝা যাচ্ছে রাডারের ওপর আক্রমণ আসছে, কাজেই এমন এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে কর্নেল, যাতে কেবল রাডার রক্ষাই নয়, যারা আক্রমণ করতে আসবে, তারা যাতে জ্যান্ত ফিরে যেতে না পারে, সে কাজও হয়। সমস্ত আয়োজন চূড়ান্ত। এখন সময়ের অপেক্ষায় আছে কর্নেল। জানে, রাতে মেঘ কেটে যাবে। আক্রমণ যদি আসে, ওই সময়ই আসবে।

কুঁড়েঘরের পাহারায় বারোজন স্পেৎসনাজ আছে এ মুহূর্তে। তাদের জন্যে এমন ডিউটি রোস্টার করেছে সে, যাতে পালা করে দুই ঘণ্টা ডিউটি ও চার ঘণ্টা রেস্ট নিতে পারে প্রত্যেকে। এর ফলে সবসময় আটজন করে রেস্টে থাকছে। এতে তার দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি প্রতি মুহূর্ত সতর্ক থাকবে।

টেকনিশিয়ান দু'জনকে গোণার বাইরে রেখেছে ম্যাকারভ, কারণ তারা এয়ার ফোর্স পারসোনেল। কোন ধরনের অ্যাকশনের ট্রেনিং নেই। যুদ্ধ যদি হাতাহাতি লড়াইয়ে পরিণত হয়, ওরা বরং তখন সমস্যার কারণ হয়েই দাঁড়াবে।

বাইরে থেকে এক টেকনিশিয়ান এসে ভেতরে ঢুকল, সেই সাথে এলো এক ঝলক হাড়জমানো ঠাণ্ডা বাতাস ও উড়ন্ত তুষার। স্টোভের তাপে গরম করা ঘর মুহূর্তে আইসবক্সে পরিণত হলো।

'দরজা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাকারভ। 'আক্কেল সবটুকু দেশে রেখে এসেছ নাকি?'

'দুঃখিত, কমরেড পলকভনিক,' তাড়াতাড়ি ওটা বন্ধ করে দিল সে। 'কন্ট্রোল সেন্টার থেকে ব্লোয়ারে আপনাকে ডাকছেন কমরেড চৌধুরী।'

উঠে দাঁড়াল কর্নেল। 'চলো।' হাট থেকে বেরিয়ে এলো, জোর বাতাস আর তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে প্রায় অন্ধের মত এগোল ভ্যানের দিকে; খাটো ল্যাডার বেয়ে ঢুকে পড়ল ভ্যানের উষ্ণ অভ্যন্তরে। মৃদু গুঞ্জন করছে যন্ত্রপাতি। কাস্টম-বিল্ট কনসোল আর প্রচুর বৃত্তাকার আলোকিত স্ক্রীনে প্রায় বোঝাই ওটা। বাইরের পৃথিবীতে কি ঘটছে, ভেতর থেকে বোঝার কোন উপায়ই নেই।

একটা স্যুইভেলে বসে টেলিফোন তুলল কর্নেল। 'ইয়েস!'

'ম্যাকারভ!' উত্তেজিত শোনাল কবীর চৌধুরীর গলা। এই ডাকটাও অপরিচিত, ভুরু কোঁচকাল কর্নেল।

'স্যার!'

'ওপরের অবস্থা কি?'

'কোন ডেভেলপমেন্ট নেই, স্যার। নর্মাল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, শত্রুকে জ্যান্ত ধরতে হবে আপনাকে। যদি রাডার হুমকির মুখে পড়ে, কেবল তখনই ওদেরকে খুন করতে পারবেন আপনি। আদারওয়াইজ না। ইট'স অ্যান অর্ডার। বুঝতে পেরেছেন?'

না দেখেও ম্যাকারভ বুঝল তার সহকারী ক্যাপটেন পাপুকিনকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলছে মানুষটা। ওকে সাক্ষী হিসেবে পরে ব্যবহার করবে প্রয়োজন হলে। 'ইয়েস, স্যার!' রাগ চেপে রেখে বলল।

'রাডার রক্ষা করা আর শত্রুকে জ্যান্ত ধরা, দুটোই সমান জরুরী। কোনটার বেলায় ঢিল দেয়া চলবে না।'

'ওকে, স্যার!' ফোন রেখে গজগজ করতে করতে কুঁড়েঘরে ফিরে এল সে।

ছয়টার খানিক পর থেমে পড়ল রানা। বুঝল, জায়গামত পৌঁছে গেছে। উল্টোপাল্টা বাতাসে তুলোর মত উড়ছে তুষার। অবশ্য বাতাসের তেজ কমে এসেছে অনেকটাই।

একটার ভেতরে দু'জন করে আশ্রয় নিতে পারে, এমন সাইজের কয়েকটা গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিল ও, তারপর খাওয়া-দাওয়া। জনসন তার রেডিও নিয়ে বসে পড়ল নিজেদের পজিশন ট্রান্সমিট করার জন্যে। এদিকে রানা হাওয়ার্ড স্মিথকে এক পাশে ডেকে নিয়ে খুব নিচু কণ্ঠে আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে।

'এখানে রাত একটা পর্যন্ত থাকব আমরা,' বলল ও। 'তারপর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে এগোব।'

'অলারইট, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি লীডার।

'আসল মুহূর্তে টোটাল সারপ্রাইজ চাই। আমি অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি ছুঁড়বে না। অবশ্য যদি বাধ্য না হতে হয়।'

'রাইট। আমি জানিয়ে দেব সবাইকে।'

রেডিও ছেড়ে উঠে এল জনসন। চিন্তিত। 'স্যার, বারবার চেষ্টা করেও ওদের

সাড়া পাচ্ছি না। লাইনে ভীষণ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে এখনও।'

মুখ দিয়ে জঘন্য খিস্তি বেরিয়ে আসছিল রানার, সময়মত সামলে নিল সোহানা কাছেই রয়েছে দেখে। ওদের দুজনের জন্যে গর্ত খুঁড়ছে সোহানা। 'ওকে, জনসন,' বলল রানা। 'আগে বিশ্রামের আয়োজন শেষ করো। পরে দেখা যাবে।' স্মিথের সাথে বাকি আলোচনা সেরে নিজেদের গর্তের দিকে এগোল ও। জনসন ও বাকহার্ড ঢুকে পড়ল পাশের গর্তটায়, হাত দশেকের মধ্যে।

লোকটা যে যোগাযোগের চেষ্টা ছাড়েনি, একটু পরই তা বোঝা গেল। বড়জোর দশ মিনিট পর গর্ত থেকে উঁকি দিল সে, 'স্যার! মেজর!' নিচু গলায় ডাকল।

খাওয়া ফেলে উঠল রানা। 'কি?'

'বোডো সাড়া দিয়েছে, স্যার! কিন্তু···ইট'স অ্যান অপ ইমিডিয়েট!' উঠে এসে ওয়ান টাইম প্যাডে ডিকোড করা মেসেজটা ওকে দিল সে।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। প্রথমে সোহানা, তারপর স্মিথের দিকে তাকাল ও–বিস্মিত, হতাশ। ওটা সবাইকে শুনিয়ে পড়ল রানা, লেখা আছে: ভার্জিনিয়া রিজ ক্যানসেলড। কন্ট্যাক্ট সাউথ উইন্ড ফর এক্সফিল্টারেশন। এনিমি পেট্রল রিপোর্টেড ইওর এরিয়া। অ্যাকনলেজ।

চুপ করে থাকল ও। অন্যরাও নীরব। যে জাহাজ থেকে মিশন শেষে ওদেরকে তুলে নিতে কপ্টার আসবে, সেটার নাম সাউথ উইন্ড। এই মেসেজ দেয়ার জন্যে কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে কন্ট্রোল? ভাবল রানা, একদিন? দু'দিন?

এরকম মুহূর্তে এই মেসেজ কেন? ফাঁস হয়ে গেছে ভার্জিনিয়া রিজের কথা? জেনে গেছে প্রতিপক্ষ?

এনিমি পেট্রল রিপোর্টেড ইওর এরিয়া–এই ক'টা শব্দের মধ্যে কী ভয়ঙ্কর বিপদ লুকিয়ে আছে, বুঝতে পেরে চিন্তায় পড়ে গেল ও। নিশ্চয়ই মিশনের কথা ফাঁস হয়ে গেছে, কোথাও থেকে লীক করেছে খবর। নইলে একেবারে শেষ মুহূর্তে অ্যাডমিরাল কিং এরকম সিদ্ধান্ত নিতেন না।

টার্গেটের এত কাছে এসে ফিরে যেতে হবে? ভাবছে রানা। এত কাছে এসে? আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেখানে···কিন্তু এ নির্দেশ তো অমান্যও করতে পারে না ও। একা রানা নয়, আরও অনেকগুলো জীবনের প্রশ্ন এর সাথে জড়িত, নির্দেশ অমান্য করলে যদি বিপদ ঘটে যায়? যদি রুশ টহল বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যায় ওরা? বা কারও মৃত্যু হয়? কি জবাব দেবে?

কাছেপিঠে রুশ পেট্রলের উপস্থিতির কথা প্রায় প্রথম থেকেই জানত রানা, ধরে নিয়েছিল নিরাপত্তামূলক নিয়মিত টহলে আছে তারা। কিন্তু এই মেসেজ প্রমাণ করে তা সত্যি নয়। ওদেরকেই খুঁজছে ব্যাটারা। অর্থাৎ এখানকার রুশ কন্ট্রোল জানে ওদের আগমনের কথা!

'কি করবেন এখন, স্যার?' স্মিথ জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি,' গম্ভীর গলায় বলল ও। মেসেজের জবাব লিখল: ইওর অপ ইমিডিয়েট রিসিভড্। উইন্ড ফোর্স ফোর। ভিজিবিলিটি ১০০ মিটার। ওটা তুলে দিল জনসনের হাতে। 'পাঠিয়ে দাও।'

'রাইট, স্যার।'

'পিআরসি রেডি রাখো। যে কোন মুহূর্তে কপ্টার কল করতে হতে পারে। চারদিকে কড়া নজর রাখবে সবাই।'

'ওকে, স্যার।'

রানাকে দেখে বার্নারে এক প্যান ঠাসা তুষার চাপাল সোহানা। 'এখন কি? ফিরে যেতে হবে?'

খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিয়ে গাল চুলকাল ও। চিন্তিত। 'বুঝতে পারছি না কি করব। এত কাছে এসে ফিরে যেতে হবে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।'

এ নিয়ে আর কিছু না বলে কাজে লেগে পড়ল সোহানা, তুষার গলা পানি টগ্‌বগ্ করে ফুটছে দেখে বলল, 'কই, জুতো খোলো। দেখি কি অবস্থা তোমার পায়ের।'

ডান পায়ের স্নো শূ ও পুরু উলের মোজা খুলে ফেলল ও, দেখল টকটকে লাল হয়ে আছে বুড়ো আঙুলটা। সাবধানে ওটাকে পানিতে চোবাল রানা, প্রথমে কিছুই টের পাওয়া গেল না। মিনিট তিনেক পর ব্যথা শুরু হলো–প্রচণ্ড টনটনে ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকল ও।

আধঘণ্টা পর খাবার গরম করে খেয়ে নিল দু'জনে।

'নেভি এই এলাকা থেকে সরে যেতে বলছে আমাদেরকে,' পলসেন বলল। 'বলছে বিপজ্জনক এলাকায় এসে পড়েছি আমরা।'

'মরার যন্ত্রণা!' ক্লিফোর্ড বলল বিরক্ত কণ্ঠে। 'ভাগ্য এত উল্টোপাল্টা করছে কেন?'

মাঝরাত হতে আর ঘণ্টা দুয়েক বাকি, অনেক আগেই ইসফিওর্ডের বটলনেক এন্ট্রান্স পেরিয়ে এসেছে নর্দার্ন লাইট। ধক্ ধক্ করছে ওটার ডিজেল এঞ্জিন। নরওয়েজিয়ান ফ্ল্যাগ উড়িয়ে চলছে ট্রলার। ওয়েসটনের ধারণা ছিল উপকূলের বারো মাইলের ভেতরে থাকলে রুশ নেভি কিছু করতে পারবে না।

তবু ব্যাটারা ইঁদুর-বেড়াল খেলছে ওদের সাথে, ওরা সবাই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। নিরাপত্তার খোঁজে দক্ষিণে এগোনোও ঠিক মনে হচ্ছে না, কারণ ব্যারেন্ট সাগরই আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নরওয়েজিয়ান নেভির দেয়া খবর অনুযায়ী আর তিন ঘণ্টা পর ওই সাগরে রুশ নেভির বিরুদ্ধে টোটাল ব্লকেড ঘোষণা করতে যাচ্ছে ন্যাটো। সমস্যা।

'আমার মনে হয়,' চার্টের ওপর চোখ রেখে ডিলন বলল, 'উল্টোদিকে যাওয়াই এখন নিরাপদ হবে আমাদের জন্যে। উত্তরের প্যাক আইসের দিকে।'

'চ্যানেল ক্রুজ শিপগুলোও ওদিকেই যাবে,' ওয়েসটন বলল। 'দর্শনীয় এক দৃশ্য হবে।'

'গুলি মারো দৃশ্যের!' বলল ক্লিফোর্ড। 'আমরা...'

'আমি চাচ্ছি, ধারেকাছে কোথাও কোন ইনলেট থাকলে তার ভেতরে ঢুকে বসে থাকতে। বা খাড়া কোন ফাটল...' ম্যাপে টোকা দিয়ে একটা খুদে ফিওর্ড দেখাল ওয়েসটন। বিশ মাইল সামনে রয়েছে ওটা। 'এখানে লুকিয়ে থাকতে পারি না আমরা?'

'সেইন্ট জনসফিওর্ডে?' খুশি হয়ে উঠল ডিলন। 'নিশ্চই পারি! কিন্তু ওখানে পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগবে।'

'লাগুক, চলো।' হাসল ওয়েসটন। ট্রেনিং কাজে লাগানোর সুযোগ একটা পাওয়া গেছে ভেবে বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে ঘাপটি মেরে বসে থাকা যাবে সমস্ত সুইচ অফ করে। ক্লিফের খুব কাছে থাকলে নর্দার্ন লাইটের রাডার ইকো সনাক্ত করতে পারবে না কেউ। 'এরিয়াল ফটোগ্রাফির হাত থেকে হয়তো বাঁচা যাবে না,' বলল সে। 'তবে সে চেষ্টা এখানে করা হবে বলেও মনে হয় না। দুই-একদিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

কাউকে ডেকে দিতে হলো না, এমনিতেই ঘুম ভেঙে গেল মাসুদ রানার। আসলে সত্যিকারের ঘুম যাকে বলে, তা ওর আসেইনি। শত্রু কাছেই রয়েছে, এই চিন্তা অবচেতন মন জুড়ে বসে থাকলে ঘুমাতে পারে না রানা। স্রেফ চোখ বুজে পড়ে ছিল।

মেঘ দ্রুত কেটে যাচ্ছে দেখল ও। পাহাড়ের মাথায় লেগে আছে ছোট ছোট টুকরো হয়ে, যেন দীর্ঘ সময়ের আশ্রয় ছেড়ে যেতে চাইছে না মন। গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও, জনসনকে কপ্টার কল করতে বলে এদিক-ওদিক তাকাল। দলের সঠিক অবস্থান জানা খুব জরুরী এখন। পিছনে দক্ষিণ, ওদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া সেই রিজ। আগে ওটাকে যত কাছে মনে হচ্ছিল, এখন সেরকম লাগল না।

পশ্চিমে তাকাল রানা। লংইয়ারবিয়েন উপত্যকা হাঁ করে আছে ওদিকটায়। কম্পাস চেক করে ভুলটা ধরতে পারল ও। প্লাটা বেরগেটের যেখানে পৌঁছার কথা ছিল, সেখান থেকে অন্তত এক হাজার মিটার দূরে এসে আশ্রয় গেড়েছে ওরা। ঘন কুয়াশার কারণে অন্য এক ছোটখাট রাইজকে মূল রিজের তলা ধরে নিয়েছিল, যার ফলে এই বিপত্তি ঘটে গেছে।

ম্যাপে চোখ বুলাল রানা ভাল করে, তারপর জনসনের উদ্দেশে বলল, 'সাউথ উইন্ডকে জানাও, আমাদের পজিশন সেভেন্টি এইট ফিফটিন নর্থ, ফিফটিন থার্টি ঈস্ট।'

কথাটা শেষ করেই বোকা বনে গেল রানা। একচুল নড়ছে না। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোহানা আর জনসনও হঠাৎ মূর্তি হয়ে গেছে সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে। মেঘের শেষ টুকরোটাও সরে গেছে প্লাটা বেরগেটের কেন্দ্র থেকে, আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে রুশ আর্লি ওয়ার্নিং রাডার।

'ডাউন!' মুহূর্তে সামলে নিয়ে চিৎকার করে উঠল ও, বুক দিয়ে আছড়ে পড়ল তুষারে। ব্যস্ত হাতে বিনকিউলার চোখে লাগাল। এক লাফে সামনে চলে এল গোটা এস্টাবলিশমেন্ট। ভ্যান আর হাটের ওপর চোখ বুলাল ও। মনে হলো একটা টিপির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানটা, ওটার সামান্য দূরে একটা হাট, ছাদে পুরু হয়ে জমে আছে তুষার।

ওগুলো কি? স্নো স্কুটার?

তুষারের তৈরি ব্যারিকেডের ওপাশে বেশ কয়েকটা মাথা দেখতে পেয়ে

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ও। ইয়াল্লা! রাডারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা…? মর্টারও আছে ওদের সাথে? ওটার কালো মাথা ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে খানিকটা জেগে আছে। সাদা ড্রেস পরা এক সৈনিককে ওটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। অফিসার হবে খুব সম্ভব, হাতে একটা মেগাফোন। একদম খোলা জায়গায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

খুব দ্রুত কম্পাস বেয়ারিং নিল রানা। অনড় জনসনের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে নিজেই ট্রান্সমিট করতে লাগল। 'দিস ইজ সিক্স। শত্রুর চোখে পড়ে গিয়েছি আমরা, মিশন বাতিল করা সম্ভব নয়। ওদের পজিশন অ্যাজিমাথ থ্রী ওয়ান টু ডিগ্রীজ ফিফটিন হান্ড্রেড মিটারস। সেন্ড দ্য কপ্টার ইমিডিয়েটলি।'

রাশিয়ানদের এত কাছে রয়েছে ওরা, বিশ্বাসই হচ্ছে না রানার। কালো ব্যারেলটায় ধোঁয়ার মেঘ দেখল ও শেষ মুহূর্তে।

শত্রুর দেখা পেয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না কর্নেল ম্যাকারভ। একই জায়গায়, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কমান্ড দিচ্ছে। তার হিসেবে ষোলোশো মিটার দূরে আছে শত্রু, তবু রেঞ্জ আরও কমিয়ে সাড়ে পনেরোশো মিটারে গোলা বর্ষণ চালিয়ে যেতে বলল সে। শত্রুকে খতম করা উদ্দেশ্য নয়, জায়গায় আটকে রাখতে চায় ওদেরকে। একই সাথে সিগন্যালারকে নিজেদের ফাইটিং পেট্রলের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বলল সে, এতক্ষণে গ্লেসিয়ারের মাথায় পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই দলটা।

'কমরেড পলকভনিক,' কাজ শেষ হতে চেঁচিয়ে বলল সিগন্যালার। 'ওরা ছয় হাজার মিটার দূরে আছে এখনও।'

ওয়েদার যত পরিষ্কারই হোক, ভাবল ম্যাকারভ, এত পথ স্কি করে আসতে কম করেও এক ঘণ্টা লাগবে। নিজে মাইক্রোফোন তুলে নিল সে, পেট্রল বাহিনীর অফিসারকে নির্দেশ দিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে পিছন থেকে শত্রুকে ঘিরে ফেলতে। ওরা যাতে রিট্রিট করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলল।

মাইক্রোফোন সিগন্যালারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সামনে তাকাল সে, তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ওপক্ষের দু'জন উন্মত্তের মত স্কি করে মালভূমির নিচু, শিরার মত এক রিজের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের একজনের কাঁধে মিসাইল লঞ্চার।

ওই জিনিস দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল ম্যাকারভ। ড্যাম ইট! তার রাডার ভ্যান আর্মার্ড নয়, মিসাইল হিট করলে সর্বনাশ। যে কোন মিসাইল হোক, কোন ব্যাপার নয়। রাডার খতম হয়ে যাবে। মর্টার ক্রুদের শিরাটা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল সে। এক ভীত-সন্ত্রস্ত টেকনিশিয়ান ভ্যান থেকে বেরিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এল তার দিকে।

'পশ্চিম দিক থেকে দুটো এয়ারক্র্যাফট আসছে, কমরেড পলকভনিক!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, একইসাথে স্যালুট করার কসরতও করল। 'রেঞ্জ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার, স্পীড একশো সত্তর। খুব সম্ভব হেলিকপ্টার, হস্টাইল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, কমরেড,' হাত নেড়ে লোকটাকে দূর হয়ে যেতে বলল। ব্যাটা আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে দেখে তার প্রতি বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেছে মন।

মনে মনে হিসেব শুরু করে দিল সে প্রায় কম্পিউটারের গতিতে। অজ্ঞাত কপ্টার দুটোর গতি, দূরত্ব, তার সাথে টাইমিং, মিসাইল, সবই বিশেষ কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে। খুব সম্ভব ধারেকাছের কোন গান শিপ থেকে আসছে কপ্টার, অর্থাৎ নিখুঁতভাবে সমন্বিত এক হিট-অ্যান্ড রান মিশনের মুখে পড়েছে ম্যাকারভ।

চোদ্দ মিনিট কি তারও কম সময়ের মধ্যেই সম্ভবত সব শেষ হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে তার ফাইটিং পেট্রল পৌঁছতে পারছে না, লংইয়ারবিয়েন থেকে রিইনফোর্সমেন্ট আনিয়ে নেয়ারও সময় নেই। তাতেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখন যা করার তাকেই করতে হবে। সামনের ওদেরকে ঘেরাও করতে হবে, ভাবল সে। স্নো স্কুটারে করে কয়েকজন স্পেৎসনাজকে পাঠিয়ে দেবে ব্যাটাদের ঠাণ্ডা করতে। একই সঙ্গে চলবে মর্টারের গোলাবর্ষণও।

এদিকে সে নিজে স্ট্রেলা মিসাইল নিয়ে কপ্টারের মুখোমুখি হবে। উপায় নেই। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সূর্য উঁকি দিল তার পিছনে, উত্তর দিগন্তে। এবার আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে শত্রুদের। আর্কটিকের মাঝরাতের সূর্যের আলো নিশ্চয়ই ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, ভাবল কর্নেল।

ব্যাপারটা তার জন্যে বোনাস হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে বড্ড লেট বোনাস, এই যা।

দশ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরপর চারটে মর্টার বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে ওদের সামনে এসে পড়ল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল সবার, তুষারের মেঘ লাফিয়ে উঠল শূন্যে। শ্রাপনেল আর ছোট ছোট বরফের টুকরো বোঁ বোঁ করে ছোটাছুটি করে বেড়াল। রানা ও সোহানা খুব কাছাকাছি মুখ গুঁজে পড়ে থাকল তুষারে। জনসন রেডিওর পাশে, অন্যরা যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে।

গোলা বর্ষণ বন্ধ হতে একে একে মুখ তুলল সবাই, হাত দিয়ে মুখে লেগে থাকা তুষারের গুঁড়ো পরিষ্কার করে সামনে তাকাল। 'হেভেনস টীথ!' বলে উঠল জনসন। 'এবারেরগুলো নির্ঘাত মাথায় পড়বে!'

তেরো

এখনই বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল রানা, কয়েক গজ সামনে প্রায় পাশাপাশি সৃষ্টি হওয়া চারটে গর্ত দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল। মতলব কি ব্যাটাদের? ভাবছে ও, টার্গেট সংশোধনের চেষ্টা না করে, একবারও না থেমে ভুল টার্গেটে এতগুলো শেল খরচ করার অর্থ কি? ওদেরকে জায়গায় আটকে রাখার জন্যে?

সে যা-ই হোক, তার পিছনে মাথা ঘামানোর মত সময় নেই। যা করার খুব দ্রুত করতে হবে।

'স্মিথ!' হাঁক ছাড়ল ও। 'ড্রাগন বের করো, কুইক!' হাত তুলে দূরে শিরার মত জেগে থাকা একটা রাইজ দেখাল। 'ওটার আড়ালে যাচ্ছি আমরা দু'জন। ওখান থেকে মর্টার এমপ্লেসমেন্ট আর রাডারের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এদিক সামাল দাও। ওরা হয়তো আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে, ঠেকাও ওদের। আমরা যদি সময়মত ফিরতে না পারি, ওখান থেকে পিক্ করবে, অল রাইট?'

'স্যার!' ইতস্তত করতে লাগল ক্যাপ্টেন। 'আপনারা দু'জন...'

'হোয়াই? এনিথিং রং?'

'না, স্যার। আপনি বললে আমি আর ত্রেভিনস্কি...'

'ডু হোয়াট আই সে, ম্যান! রান!'

'রাইট!' ঘুরে নিজের গর্তের দিকে ছুটল সে ড্রাগন আনতে।

'সোহানা, স্কি পরে নাও। মিলার!'

'মেজর!'

'ওয়াচ!'

ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে স্কি পরে নিল রানা ও সোহানা, তারপর মিসাইলের বিযুক্ত অংশ কাঁধে নিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল। রানা আগে, সোহানা পিছনে।

তার আগেই নিজের স্পেশাল স্নাইপার রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে মিলার। সাইটে চোখ রেখে স্থির হয়ে শুয়ে আছে। ছয়শো গজের মত দূরে রয়েছে শিরাটা, দুই কমান্ডো সেদিকে ছুটছে স্প্রিন্টারের মত। দেহ সামনে ঝুঁকে আছে, হাত আর পা দোল খাচ্ছে নিয়মিত ছন্দে, কাঁধ ঘনঘন ডানে-বায়ে করছে। রাইজে পৌঁছতে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট লাগবে ওদের, মিলার ভাবল।

মর্টার বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল মাটি, রাইজের একটু ওপাশে পড়েছে গোলা। চোখের কোণ দিয়ে রাডারের কাছে নতুন তৎপরতা দেখতে পেয়ে ঘুরে তাকাল মিলার। আটজন রুশ সৈন্য দৌড়ে গিয়ে চারটা স্নো স্কুটারে উঠে বসল, এক গাদা তুষার ছিটিয়ে এদিকে মুখ করে ছুটে আসতে শুরু করল। সরাসরি সূর্যের আলো পড়ায় ক্ষণিকের জন্যে দৃষ্টি ঝলসে গেল মিলারের। কয়েকবার চোখ পিট্ পিট করে আবার তাকাল সে, দেহটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে।

টেলিস্কোপিক সাইটের সাহায্যে স্কুটার বাহিনীকে অনুসরণ করতে লাগল মিলার। বেশ খানিকটা ঘুরে আসছে ওরা। মতলব পরিষ্কার, মেজর রানা ও সোহানার পিছনে পৌঁছতে চাইছে। তাই যদি হয়, দ্রুত হিসেব কষে ফেলল মিলার, তাহলে তার পাঁচশো গজ সামনে দিয়ে যেতে হবে ওদেরকে; এবং তার রাইফেলের নির্ভুল লক্ষ্যভেদের দূরত্বও পাঁচশো গজই।

তবে হারামীরা বেশি জোরে ছুটছে। এই গতিতে চলমান টার্গেটে চেষ্টা করলে গুলি ঠিকই লাগাতে পারবে সে, কিন্তু তাতে শিকার মরবে কি না সন্দেহ। আরেকটু ঘুরল মিলার, ব্যারেল ঘোরাল। লীডিং স্কুটার ঘুরে গেছে, সোজা তার দিকেই আসছে। ড্রাইভারের হেলমেট পরা মাথা একদম স্পষ্ট দেখতে পেল সে।

এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই ঝপ্ করে নিচের দিকে নেমে গেল স্কুটার, গিরিখাতে নেমে পড়েছে।

একটু পরই আবার দেখা দিল ওটা। নাক উঁচু করে ছোট্ট এক লাফে এপারে এসে পড়ল। পরপর তিনটে গুলি করল মিলার, ড্রাইভারকে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখল। পরমুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল স্কুটার। ওটা উল্টে পড়ার আগমুহূর্তে ভেতর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এল দ্বিতীয়জন।

'একটা গেল,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আর তিনটে...' অন্যগুলোকে চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে থেমে গেল। বিপদ টের পেয়ে স্কুটার ছেড়ে নেমে পড়ল লোকগুলো, তার ডান ও বাঁ দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আধখানা চাঁদের মত গোল হয়ে। শুয়ে পড়ে ক্রল করে শিরাটার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

ওদিকে রানা ও সোহানা পৌঁছে গেছে ওটার আড়ালে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পা স্কির স্ট্র্যাপমুক্ত করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। একটু সামলে নিয়ে মুখ তুলল রানা, ঠিক তখনই আরেকটা শেল এসে পড়ল কয়েক গজ সামনে। টুপ্ করে ডুব দিল ও। রাইজের একটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল গোলাটা। মেটাল ফ্র্যাগমেন্ট আর পাথরের ছোট্ট ছোট টুকরো ছিট্‌কে উঠল আকাশে।

সামলে নিয়ে ব্যস্ত হাতে ড্রাগন লঞ্চারের বাইপডের ভাঁজ খুলল রানা, ওটাকে দাঁড় করিয়ে অপটিক্যাল সাইট অ্যাডজাস্ট করে টিউবের শেষ মাথা কাঁধে তুলে নিল। দাঁতে দাঁত চেপে নির্দেশ দিল, 'লোড!'

সাথে সাথে প্রথম রাউন্ড টিউবে ঠেসে দিল সোহানা, একই মুহূর্তে রানাও ফায়ারিং মেকানিজম টেনে দিল, রুশ ক্রুরা তখন আরেক রাউন্ড গোলা ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক ঝলক ধোঁয়া বের হতে দেখল রানা ড্রাগনের লেজ দিয়ে, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে প্রজেক্টাইলটাকেও স্পষ্ট দেখতে পেল–কাঁপা কাঁপা, কালো একটা বিন্দু, এঁকেবেঁকে ছুটে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত পর রুশ মর্টার পিট ছিট্‌কে উঠে গেল আকাশে, একই সাথে একটা উজ্জ্বল হলদেটে আলোর ঝলকও দেখা গেল, মর্টারের একটা শেল বিস্ফোরিত হয়েছে। রানার মনে হলো, গোড়া থেকে ছিঁড়ে যাওয়া রক্তাক্ত একটা হাতও উড়ে যেতে দেখেছে ও।

খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হতে পারল না। বাতাসে শিস কাটার তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, এদিকেই আসছে। ধ্বংস হওয়ার আগমুহূর্তে রুশ মর্টারের ছোঁড়া শেষ গোলা। অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা কুঁকড়ে গেল ওর–আওয়াজটা বাড়ছে। ওদের চারদিকের সাদা পৃথিবী আচমকা বিস্ফোরিত হলো, লঞ্চার উড়ে গেল রানার কাঁধ থেকে।

কতক্ষণ পর হুঁশ হলো খেয়াল নেই ওর, কোথাও আঘাত লেগেছে কি না, অনুভব করার চেষ্টা করল। না, লাগেনি। ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় কানের কাছে কাউকে গোঙাতে শুনে অনেক কষ্টে উঠে বসল। সোহানাকে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ

খেলে গেল যেন দেহে, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল রানা।

সোহানার রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে তুষার, প্রচুর রক্ত পড়ছে। আঘাতটা ডান পায়ে লেগেছে ওর, হাঁটুর পিছন দিকে। বাঁ পা খালি। স্নো বুটটা দুই গজ দূরে পড়ে আছে। এক লাফে ওর কাছে গিয়ে বসল রানা।

'সোহানা!' ত্রস্ত গলায় ডাকল ও। 'সোহানা!'

সাড়া নেই। তবে এখনও বেঁচে আছে ও, ধীরগতিতে ওঠানামা করছে বুক। নিথর দেহটার নিচে রক্তের দ্রুত বিস্তৃতি দেখে আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল রানার। তাড়াতাড়ি ওয়েব গিয়ার থেকে একটা ফিল্ড ড্রেসিং বের করে ঝুঁকে বসল ও, সোহানার পায়ের হাঁ হয়ে থাকা বড়সড় ক্ষতটা বেঁধে ফেলল মজবুত করে। কিন্তু রক্ত পড়া পুরোপুরি বন্ধ হলো না তাতে, ড্রেসিং ভিজে উঠল দেখতে দেখতে। পারকার নিচে গলায় পেঁচানো নিজের উলের ব্যানডানাটা খুলে ফেলল রানা, ওটা দিয়ে হাঁটুর নিচে কষে বাঁধল।

এবার কাজ হলো। শিরায় চাপ পড়তে কমে এল রক্ত পড়া। আরও কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে চোখ মেলল সোহানা। ঘোলা চাউনি, কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। ওর মুখের মধ্যে একটা মরফিন ক্যাপসুল ছেড়ে দিল রানা, গাল ধরে ঝাঁকাল। 'গিলে ফেলো, সোহানা! ক্যাপসুলটা গিলে ফেলো!'

চোখের মণি নড়ে উঠল সোহানার, চাউনি জ্যান্ত হয়ে উঠল। খানিক এদিক-ওদিক করে স্থির হলো রানার উদ্বিগ্ন মুখের ওপর।

'রানা!' অস্পষ্ট গলায় ডাকল সোহানা। হাসতে চাইল, কিন্তু ব্যথায় কুঁচকে উঠল চোখমুখ। 'কি-কি হয়েছে, রানা?'

'তেমন কিছু না,' ওর মুখের ওপর জমে ওঠা তুষার পরম যত্নে সরিয়ে দিল রানা। 'কিছু না। পায়ে একটা সপ্লিন্টার বিঁধেছে তোমার। ভয় নেই, আমি ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। কপ্টার এসে পড়বে এখনই। কোন চিন্তা নেই।'

চোখের পাতা বুজে 'হ্যাঁ' বোঝাল সোহানা।

'চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি বাকি কাজ সেরে আসছি।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে উঠে পড়ল রানা, ভয়ের কিছু নেই। সেরে উঠবে সোহানা, আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। লঞ্চার কুড়িয়ে নিয়ে লোড করল ও, কাঁধে তুলে নিল টিউব। বাইপডের ওপর লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপে দিল। পারকার ওপর দিয়েও ওটার উত্তাপ অনুভব করল রানা। গাইডেন্সের দিকে মন দিল।

ভ্যানের সাথে ড্রাগনের সংঘর্ষের ইমপ্যাক্ট হলো দেখার মত। মাটির ভিত্ ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ওটা, পরমুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল পেটের কাছে। স্ক্যানার থেমে গেছে। ভ্যানের যে একটা সাইড দরজা আছে, জানত না রানা। জানল একটু পর, ভেতর থেকে মশালের মত সারা দেহে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে লাফাতে লাফাতে এক টেকনিশিয়ানকে বেরিয়ে আসতে দেখে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ভ্যানে আগুন ধরে গেল।

পিছনের কুঁড়ে থেকে কয়েকজন সৈন্যকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। তাদের একজনের হাতে লম্বা একটা টিউব। মিসাইল! তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল

রানা, আরেক রাউন্ড ঠেসে দিল লাঞ্চারে। আর চারটে মিসাইল আছে ওর স্টকে।

ততক্ষণে অনেক কাছে চলে এসেছে স্নো স্কুটারের সাত সৈন্য। কয়েক পা দৌড়ে আসছে ওরা, শুয়ে পড়ে গুলি করছে, আবার উঠে দৌড়ে আসছে। ওদিকে মিলার, নেইলসন, বাকহার্ড, ত্রেভিনস্কিসহ অন্যরা ব্যস্ত লোকগুলোকে সামলাতে। ওর মধ্যেও কপ্টারের কথা ভোলেনি হাওয়ার্ড স্মিথ। ও দুটোকে গাইড করতে হবে। রেডিওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সে।

'দিস্ ইজ সিক্স। আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে শত্রু বাহিনী। আমাদের পজিশন থেকে তিনশো গজ পুবে, রিপিট, তিনশো গজ পুবে রয়েছে ওরা। এগিয়ে আসছে।'

'তিন মিনিট পর মার্কার ছুঁড়বেন,' জবাব দিল পাইলট। 'কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে শত্রু বাহিনীর হাতে?'

'মূলত রাইফেল,' স্মিথ বলল। 'মর্টার ছিল, ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।'

'আমরা আসছি। তিন মিনিটের মধ্যে।'

'কপ্টার আসছে,' চেঁচিয়ে সবাইকে জানাল সে। স্ট্রোব লাইট জ্বালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। ধোঁয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তাতেও সমস্যা আছে, বাতাস যেদিক থেকে বইছে, তাতে ধোঁয়ার ব্যবস্থা করলে বরং উল্টো হবে। শত্রুকে নয়, ওদেরকেই ঢেকে ফেলবে তা।

অ্যাকশন সব সময় চিন্তা শক্তি বাড়িয়ে দেয় কর্নেল ম্যাকারভের। এ মুহূর্তেও তাই হয়েছে। তার সাদা হুডওয়ালা ওভারস্যুটের ফার আগুনের আঁচে কুঁকড়ে গেছে, পুড়ে কালো হয়ে গেছে। পুরো সময়ই যে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তা নয়। দূরে মিসাইল লঞ্চারের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়েছিল। নইলে বোকামি হত।

কিন্তু চোখের সামনে এত সাধের রাডার ধ্বংস হয়ে যেতে দেখামাত্র নিজেকে ফিরে পেয়েছে সে। নতুন প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। মর্টার গেছে, এখন আছে কেবল স্ট্রেলা, ওটা দিয়েই শত্রুর কপ্টারের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবছে। তার বাঁ দিকে তিনজন স্পেৎসনাজ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনকে হাট থেকে লঞ্চারসহ মিসাইলটা নিয়ে আনতে বলল সে।

লোকটা ফিরে আসতে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'পজিশন নাও। হেলিকপ্টারটা চাই আমার। আমি বললেই ফায়ার করবে।'

শেষদিকের কথাগুলো রানার ছোঁড়া ড্রাগন বিস্ফোরিত হওয়ার বিকট শব্দে চাপা পড়ে গেল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কুঁড়েঘর ওটার ধাক্কায়।

'শুয়ে থাকো!' সৈনিককে নির্দেশ দিল সে। 'কপ্টার না পৌঁছানো পর্যন্ত মাথা তুলবে না।'

মিসাইল যে ছুঁড়ছে, তার একটা ব্যবস্থা এখনই করা দরকার, ভাবল কর্নেল। নইলে কপ্টার এসে পড়লে হয়তো স্ট্রেলা কোন কাজে আসবে না। এদিকে পাহারা দেয়ার কিছু নেই, বেশি লোকের প্রয়োজনও নেই। তাই বাকি যে দুই সৈনিক ছিল, তাদেরকে স্কি করে দ্রুত শিরাটার দিকে যেতে নির্দেশ দিল কর্নেল। মিসাইলটাকে স্তব্ধ করে দিয়ে আসতে বলল। ওখানে একজন আছে এখন, জানে

সে। তার সঙ্গী হয় নিহত, নয়তো আহত। ব্যাটাকে রাইফেলের রেঞ্জে পেয়ে যদি…

চোখে বিনকিউলার লাগাল। শত্রু বাহিনীর পুবদিক থেকে এগোতে থাকা স্পেৎসনাজ বাহিনীর অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্ট হলো কর্নেল। ওদের অগ্রগতি চমৎকার। তার মানে সব আশা ফুরিয়ে যায়নি এখনও, কবীর চৌধুরীর ইচ্ছে পূরণের একটা সুযোগ হয়তো এখনও আছে। ওই লোকটাকে সন্তুষ্ট করা গেলে হয়তো…

হেলিকপ্টারের ওপর চোখ পড়ল ম্যাকারভের–দুটো। উঁচু রিজ ঘুরে এগিয়ে আসছে। খানিকটা হলুদ ধোঁয়া লাফিয়ে উঠতে দেখল সে শত্রুর মূল দলের অবস্থানের কাছে, তারপরই তুষারে খুব দ্রুত ছড়াতে লাগল হলুদ রং। ওটা মার্কার। কল্পনায় ক্যানিস্টারটা দেখতে পেল কর্নেল। উপুড় হয়ে রং ছড়াচ্ছে, দ্রুত গলে যাচ্ছে তুষার। ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা বাতাসের টানে রিজের দিকেই উড়ে যাচ্ছে দেখে মনে মনে হাসল সে।

দুটো কপ্টারের মাঝে একশো মিটারের মত ব্যবধান সম্ভবত। প্রথমটা লেজ নিচু করে ল্যান্ডিঙের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'ফায়ার!' হুঙ্কার ছাড়ল ম্যাকারভ। মনে মনে প্রার্থনা করল, ব্যাটার এইম যেন নির্ভুল হয়। অবশ্য একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে সমস্যা নেই। স্ট্রেলা উত্তাপ-সন্ধানী মিসাইল, এয়ার ক্র্যাফটের কাছে পৌঁছতে পারলে উত্তাপের সূত্র, অর্থাৎ ওটার এঞ্জিন নিজেই খুঁজে নেবে।

পনেরো সেকেন্ড পর তার প্রার্থনা কবুল হলো। শূন্যে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল প্রথম কপ্টার, মিসাইলের বিস্ফোরণ ও স্টীলের পাত ছেঁড়াখোঁড়ার ভয়াবহ শব্দ উঠল। আছড়ে পড়ল ওটা কাত হয়ে। একটু পর আকাশে লাফিয়ে উঠল দাউ দাউ আগুন। আনন্দে নেচে উঠল কর্নেলের বুক, রেডিও মাইক্রোফোন মুখের সামনে তুলে ধরল মহাব্যস্ত হয়ে।

'অ্যাসল্ট!' চেঁচিয়ে কমান্ড করল। 'নাউ! গেট দেম!'

তুষারের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সাত স্পেৎসনাজ, এলোমেলো পায়ে ছুটল শত্রুর দিকে। বিনকিউলারে চোখ রেখে সেদিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল। আশা পূরণের অপেক্ষায় আছে। সে জানে এটাই তার শেষ সুযোগ।

মার্কারের হলুদ ধোঁয়া বাতাসের টানে পল মিডল্যান্ডকে ঘিরে ফেলেছে। প্রথম কপ্টারকে সঙ্কেত দিতে যাচ্ছে সে। নাকের সামনে হাত দিয়ে বাতাস করে বদ গন্ধওয়ালা ধোঁয়া তাড়াতে ব্যস্ত। একটু একটু করে কেটে গেল ধোঁয়া, মুখ তুলে তাকাল সে।

অবাক হয়ে দেখল প্রথম কপ্টারটা নরওয়েজিয়ান এক সী কিং। দেহের পাশে জাতীয় প্রতীক আঁকা আছে ওটার। সামলে নিয়ে সঙ্কেত দিতে শুরু করল সে। নামছে সী কিং, স্লাইডিং ডোর খুলে গেছে। পাগলের মত হাসতে লাগল মিডল্যান্ড। কিন্তু পরমুহূর্তে হঠাৎ করে যন্ত্রটারে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেতে দেখে গলার কাছে আটকে গেল তার হাসি। মিসাইলের শব্দ শুনতে পায়নি।

চোখের সামনে সুন্দর, ঝকঝকে কপ্টারটাকে ভেঙেচুরে আছড়ে পড়তে দেখে চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। পরক্ষণে কেবিনের ভেতরে ক্রু চীফকে নিজের দিকের দরজা খোলার জন্যে টানা-হ্যাঁচড়া করতে দেখে হুঁশ হলো, ছুটে গেল সে। কক্‌পিটে দুই পাইলটকে দেখল স্থির হয়ে বসে আছে। স্ট্র্যাপের টানে ঝুলছে। রক্তের আর মাংসের দুটো দলা। ভয়ে ভয়ে কাত হয়ে পড়ে থাকা কপ্টারের ওপরে উঠে দাঁড়াল মিডল্যান্ড।

ওকে দেখতে পেয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্রু চীফ, জরুরী ভঙ্গিতে বারবার বাইরে থেকে দরজা খোলার ইঙ্গিত করতে লাগল। দুই-তিন হ্যাঁচকা টানে ওটা খুলে ফেলল পল, হাত বাড়িয়ে লোকটাকে বের করে আনল। তার হেলমেটের সাথে ইন্টারকমের ছেঁড়া লীড ঝুলছে খানিকটা। হেলমেট ছুঁড়ে ফেলে দিল লোকটা, পলের পিছন পিছন দৌড় দিল।

আট-দশ পা গিয়ে পিছনে হালকা বিস্ফোরণের শব্দ ও পিঠে গরম ভাপ লাগতে ঘুরে তাকাল পল। ক্রু-চীফও ঘুরল। সী কিংকে ঘিরে আগুনের নৃত্য দেখতে পেল তারা। দুই পাইলট যে যার সীটে তেমনি অনড়। কালো ধোঁয়ার কুন্ডলীর মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় কপ্টার দেখতে পেল পল, এগিয়ে আসছে।

ওদিকে ডেপুটি লীডার স্মিথ প্রথম কপ্টারের করুণ পরিণতি দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেকুব হয়ে গেল। একটু পর সামলে নিয়ে দ্বিতীয়টার আমেরিকান পাইলটের সাথে কথা বলতে শুরু করল।

'ওকে, কামন ইন,' বলল সে। 'ওদেরকে ঠাণ্ডা করার জন্যে মিসাইল আছে আমাদের কাছে।'

'শিওর থিং,' জবাব দিল পাইলট। ভয় পেয়ে থাকলেও গলার স্বরে তা বোঝা গেল না। 'আমি আসছি।'

'আপনার ঠিক পঞ্চাশ গজ সামনে আমাদের চারজন আছে, একজন আহত। প্রথমে ওদেরকে তুলে নিয়ে আসুন।'

একটু বিরতি। 'হ্যাঁ। দেখতে পেয়েছি।'

'ফাইভ ক্যাল মেশিনগান নিয়ে এসেছেন সঙ্গে?' প্রশ্ন করল স্মিথ হাওয়ার্ড।

'অবশ্যই!'

'গুড! ওদের আশেপাশে শত্রুপক্ষের রাইফেল বাহিনী আছে, সাবধানে যাবেন। বেস্ট অভ লাক।'

বড়জোর দশ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল কপ্টার। সিএইচ-৪৬ ওটা, পেটে বড় করে MARINE CORPS লেখা দেখে বড় শান্তি লাগল স্মিথের।

একটু পরই ওটার পার্সপেক্স ব্লিস্টার থেকে মেশিনগানের টানা আওয়াজ শুনতে পেল সে। একই সাথে পাইলটের গলাও। 'উই হ্যাভ ইওর গাইজ ভিজুয়াল,' বলল লোকটা। 'অ্যান্ড অলসো দ্য এনিমিজ।'

হাসল ডেপুটি। 'গ্রেট। তুলে আনুন ওদের।'

বরফের খোলা মাঠে স্তূপ করে রাখা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার যন্ত্রপাতির আড়ালে গায়ে গায়ে বসে আছে মিলার, জনসন, নেইলসন ও বাকহার্ড। সুবিধের জন্যে স্তূপের পিছনে হাঁচড়েপাঁচড়ে একটা গর্তও করে নিয়েছে। নেইলসন আহত, গুলি খেয়েছে

উরুতে। জনসন আগে থেকেই বেকার। আহত হাত দিয়ে রাইফেল তুলতে পারছে না বলে গুলি করতে পারছে না।

পিছনে রোটরের তীক্ষ্ণ চুঁই চুঁই শব্দে ঘুরে তাকাল মিলার, আমেরিকান কপ্টারটা চোখে পড়তে খুশি হয়ে নতুন উদ্যমে শত্রু খুঁজতে লেগে গেল। প্রথম আটজনের মাত্র তিনজনকে ফেলতে পেরেছে সে, এখনও রয়ে গেছে পাঁচজন। বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে। সেদিকে রাইফেল তাক্ করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষায় আছে মিলার। মন চাইছে কপ্টারে উঠে পড়ে, কিন্তু জোর করে মনটাকে সামনের দিকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করল সে।

ধৈর্যের ফল পাওয়া গেল একটু পরেই। এক স্পেৎসনাজ পলকের জন্যে মাথা তুলেই নামিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, ঝট্ করে নল একটু ঘুরিয়ে হেয়ার ট্রিগার টেনে দিল মিলার। পিছনদিকে জোর এক ঝাঁকি খেল মাথাটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাটা মরেছে কি না জানে না মিলার, তবু গোণায় ধরে নিল।

'এবার চলো!' চেঁচিয়ে বলল বাকহার্ড। আরেকবার চারদিক দেখে নিল মিলার। দেখতে পেল নেমে পড়েছে সি-এইচ ৪৬। পাইলট বুড়ো আঙুল ওপরমুখো করে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে–উঠে পড়ার সঙ্কেত দিচ্ছে। আরও একটু অপেক্ষা করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু পাইলট ও সঙ্গীরা অধৈর্য হয়ে উঠছে দেখে উঠে পড়ল, নেইলসনের পাশে চলে এল। উরুতে গুলি খেয়েছে বেচারা। তাকে ফায়ারম্যানদের কায়দায় কাঁধে তুলে নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল কপ্টারের দিকে। জনসন আর বাকহার্ডও আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

সুযোগ বুঝে উঠে পড়ল বাকি চার স্পেৎসনাজ, সমানে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু স্কির কারণে সুবিধে করতে পারছে না। নেইলসনকে কপ্টারে তুলে দিয়ে মিলার নিজেও উঠল, জনসন আর বাকহার্ড স্কি ইত্যাদি যা যা আছে, ঝট্‌পট্ তুলে ফেলতে লাগল কপ্টারে। লিডারের নির্দেশ আছে, কোন গিয়ার ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না।

জনসন উঠল সবার শেষে। কিন্তু তাড়াহুড়োয় মনের ভুলে বাঁ হাতে ডোর ফ্রেম ধরে উঠতে গিয়ে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ভাঙা হাড়ে টান পড়ায়। বাঁ হাত ছেড়ে ডান হাতে ডোর ফ্রেম ধরার চেষ্টা করল সে। হলো না, পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল তুষারে। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল, তখনই খেল গুলি। একদম ঘাড়ে। সামনের দিকে এক পা এগিয়ে এল সে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মিলার। বাকহার্ডের সাহায্যে তুলে নিল প্রায় অচেতন লোকটাকে।

উঠে পড়ল কপ্টার। জনসনকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ব্যস্ত হাতে তার পারকার হুড খুলে ফেলল বাকহার্ড, ক্ষতটা দেখল। আর্টারিতে লেগেছে গুলি, দমকে দমকে রক্ত বেরোচ্ছে। আপনমনে মাথা নাড়ল হতাশ বাকহার্ড। রক্ত পড়া বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগল। নেইলসন আর মিলারও হাত লাগাল তার সাথে।

ঘুরে এগোল সিএইচ-৪৬, জ্বলন্ত সী কিঙের ধোঁয়ার আড়ালে এসে স্মিথ, পল মিডল্যান্ড ও নরওয়েজিয়ান ক্রু চীফকে তুলে নিল। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে স্পেৎসনাজ, একটু পর পর ফিউজিলাজে ঠক্ ঠক্ করে বিঁধছে একটা-দুটো।

স্মিথ উঠেছে সামনে, দুই পাইলটের মাঝখানে বসে আঙুল তুলে মাসুদ রানা

আর সোহানাকে দেখাল সে। রাশিয়ানদের অবস্থান দেখে নিয়ে মাথা দোলাল পাইলট। 'কোন চিন্তা নেই।' ব্যাটাদের সঙ্গে মিসাইল নেই দেখে আশ্বস্ত হলো সে। রাইফেল দিয়ে বিশেষ কিছু করতে পারবে না ওরা।

হঠাৎ দূরে অন্য কিছু দেখতে পেল সে। 'শিট্! হোয়াট দ্য হেল্!'

স্মিথও তাকাল সেদিকে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া রুশ মর্টার পিটের কাছে কে যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একা। বিনকিউলারে চোখ রেখে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

'শালা, পাগল নাকি?' কপ্টার রানা-সোহানার অবস্থানের দিকে ঘুরিয়ে দিল পাইলট। 'নেপোলিয়নের বাচ্চা!'

দূর থেকে লীডারকে দেখতে পেল স্মিথ, কাঁধে ড্রাগন মিসাইল, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছে রক্তের পুকুরের মধ্যে শুয়ে আছে সোহানা। 'হারি আপ্! হারি আপ্! হারি আপ্!' বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগল সে। বাকি চার রাশিয়ান ওদের দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কপ্টারের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল রানা ।

কিন্তু নড়ল না। কোন রকম ব্যস্ততা দেখা গেল না ওর মধ্যে। ঘুরে সামনে নজর দিল। শেষ মিসাইল ছুঁড়তে প্রস্তুত।

'ওটা কি?' রুশ মর্টার পিটের কাছে আরেকটা কাঠামো দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল স্মিথ। বিনকিউলার চোখে লাগাল। পরক্ষণে দম আটকে এল তার। 'হোলি শিট্! মিসাইল ছুঁড়তে যাচ্ছে ওরা!'

'মিসাইল' শব্দটা কানে যেতে আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্যাপ্টেন। ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে চেহারা।

ব্যাপারটা চোখে পড়লেও রানা নির্বিকার, উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই ওর মধ্যে। অনেকক্ষণ থেকে এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়ই ছিল ও। আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামোটার পাশে প্রার্থিত কাঠামোটাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ড্রাগনের ট্রিগারে চেপে বসল ওর তর্জনী। ওর মত ওই লোকটার কাঁধেও একটা লম্বা টিউব। দ্বিতীয় কপ্টার লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাচ্ছে। মনে মনে তিন পর্যন্ত গুনল রানা, সাইটে চোখ রেখে দম বন্ধ করে ট্রিগার টেনে দিল। জোর এক ঝাঁকি খেয়ে উড়াল দিল ড্রাগন।

টিউব নামিয়ে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। একটু পাশ ফিরে, এক হাঁটু ভেঙে। ক্লান্ত ভঙ্গি।

মাটির বুক থেকে দ্বিতীয় কাঠামোটাকে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখে টিউব ছেড়ে দিল রানা। প্রথম কাঠামোটাও হাওয়া হয়ে গেছে। দু'মিনিট পর রানা সোহানাকে তোলা হলো কপ্টারে। ক্রু চীফ আর গানার ব্যস্ত হাতে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল সোহানাকে। একটা কমব্যাট জ্যাকেট ভাঁজ করে গুঁজে দেয়া হলো ওর মাথার নিচে।

'স্মিথ, গিয়ার কিছু পড়ে থাকেনি তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, মেজর। সব তোলা হয়েছে।'

'এনি ক্যাজুয়ালটি?'

'নান। তবে জনসন গুলি খেয়েছে।'

লোকটাকে পরখ করে দেখল ও। পিছনদিকে আরেক স্ট্রেচারে শুয়ে আছে, জ্ঞান নেই। 'কোথায় লেগেছে?'

'ঘাড়ে, স্যার,' বাকহার্ড বলল পাশ থেকে।

'কি অবস্থা?'

মাথা ডানে-বাঁয়ে করল সে। বিষণ্ন।

একটু পর চোখ মেলল জনসন। মুখের ওপর লীডারকে ঝুঁকে বসা দেখে ঠোঁট বেঁকে গেল–হাসছে। 'স্যা-স্যার···মেজর, মি-মিশন···'

ব্যাপারটা সিনেমার মত মনে হলো রানার। মৃত্যুর আগমুহূর্তে এরকম প্রশ্ন বাস্তবে কেউ করে না। 'মিশন সাকসেসফুল, জনসন,' বলল ও। 'হান্ড্রেড পার সেন্ট সাকসেসফুল। চিন্তা কোরো না, শিপে ফিরে যাচ্ছি আমরা। ওখানে বড় ডাক্তার আছে, ঠিক হয়ে যাবে তুমি।'

'সত্যি···মেজর!'

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল রানা। 'তোমার আঘাত সিরিয়াস কিছু নয়, বাকহার্ড বলেছে আমাকে। ছোট্ট একটা অপারেশন করলেই সেরে উঠবে তুমি। জাহাজে ফিরে···' থেমে গেল মুঠোয় ধরা জনসনের হাতটা শিথিল হয়ে গেছে টের পেয়ে। নাড়ি দেখল–নেই।

ওর মিথ্যে আশ্বাস শুনতে শুনতে মারা গেছে মেডিক জনসন।

একটু পর উঠল রানা, ধীর পায়ে সোহানার কাছে এসে বসল। ওর একহাত মুঠোয় তুলে নিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল, 'ভয় নেই। মন শক্ত রাখো। জাহাজে পৌঁছলেই···'

চোদ্দ

ট্রমসো, নরওয়ে।

হুলস্থুল পড়ে গেল নেভাল এয়ারবেসে। এক কুড়ি সী কিং প্রায় একযোগে স্টার্ট নেয়ায় কাঁপছে গোটা এলাকা, আওয়াজে কান পাতা দায়। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই রোটর ব্লেডের ঝিলিক, ঝল্‌সে যায় নজর।

কাছেই ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন নরওয়েজিয়ান আর্মি অফিসার চড়া গলায় একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছে। ব্যারাক থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে ফুল ইউনিফর্মড় তিনশো ফলশ্রিময়েগার, তাদের বুকের কাছে দু'হাতে ধরা আছে কারবাইন, নল একটু ওপরদিকে।

আগে থেকে নির্দিষ্ট করে রাখা সী কিঙে উঠে পড়ল তারা, এক এক করে আকাশে উঠে পড়ল ওগুলো। তিনটে করে তীরের মাথার আকৃতি নিয়ে হাঁ-হাঁ করে ছুটল লংইয়ারবিয়েনের উদ্দেশে। একটা রয়েছে সামনে–লীডার, একটা পিছনে–টেইল।

এক ঘণ্টা পর লংইয়ারবিয়েনের দক্ষিণ আকাশ ছেয়ে ফেলল সী কিং বহর,

এক এক করে নামতে শুরু করল এয়ারফিল্ডে। দুটো করে তীরের মাথা ল্যান্ড করে, সৈন্য নামিয়ে উঠে যায়, আবার দুটো তীরের মাথা নামে। দেখতে দেখতে এয়ারফিল্ড ভরে উঠল নরওয়েজিয়ান সৈন্যে। চারদিকের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর দিকে ছুটে গেল তারা, একেবারে বিনা বাধায় দখল করে নিল সবকিছু।

বাধা দেয়ার কথা ভেবেছিল সোভিয়েত বর্ডার পুলিস, কিন্তু ওপর থেকে কোন নির্দেশ না পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের কাজ দেখতে লাগল তারা।

প্লাটা বেরগেট রাডার ধ্বংস হওয়ার খবর পেয়ে খোঁজ-খবর নিতে তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে গিয়েছিল কবীর চৌধুরী, আর ফেরেনি।

ওদিকে সন্ধের দিকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া তিনজন স্পেৎসনাজ সহ ব্যারেন্টসবার্গ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে কর্নেল ম্যাকারভ। ভীষণ ক্লান্ত তখন সে, চেহারায় পরাজয়ের গ্লানি।

নরওয়েজিয়ান ডেস্ট্রয়ার স্কল। ওটার ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন জোহানসন। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে দূরের প্রকাণ্ড রাশিয়ান বাণিজ্য-জাহাজটির দিকে তাকিয়ে আছেন। গতকাল দুপুর থেকে ওটাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছেন তিনি। ডেডলাইনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভোর তিনটেয় রাডারে দেখা গেল সোয়ালবারের বারো মাইলব্যাপী নিজস্ব পানিসীমায় ঢুকতে যাচ্ছে ওটা, দক্ষিণ প্রান্তের সরক্যাপের দিকে এগোচ্ছে।

ফুল অ্যাহেড নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, গভীর ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ওটার দিকে ছুটে চলল স্কল। তার বো-র সাথে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ছে ঢেউ, ছিট্‌কে উঠে ডেক ভাসিয়ে দিচ্ছে।

রুশ জাহাজের দশ কেবলের মধ্যে পৌঁছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিও অন করলেন ক্যাপ্টেন, ওটা নরওয়ের পানিসীমায় ঢুকতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করলেন। জবাবে ধমক লাগাল রুশ ক্যাপ্টেন, কেটে পড়তে বলল। অ্যাকশন স্টেশন ঘোষণা করলেন ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন। ইন্টারন্যাশনাল ওয়েভলেংথে কথা বলছেন তিনি, ফলে সবাই শুনতে পেল সে নির্দেশ।

গতি কমেছে না রাশিয়ান জাহাজটার? ভাবলেন তিনি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ওটার প্রকাণ্ড হালের দিকে। নাহ্, আগের কোর্সেই রয়েছে। ভেতরে ভেতরে স্নায়ু টান্‌টান্ হয়ে আছে ক্যাপ্টেনের। জাহাজটার পিছনে কয়েক হাজার মাইলের উন্মুক্ত আর্কটিক সাগর, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে পর্যাপ্ত নৌ-শক্তি রিজার্ভ আছে ওখানে, ডাকলেই ছুটে আসবে।

কিন্তু রুশ জাহাজটিকে সাহায্য করার জন্যে আছে ওদের গোটা নর্দার্ন ফ্লীট এবং তার বিমান বহর। যদি তাঁকে শেষ পর্যন্ত গোলা ছুঁড়তেই হয়, কি হবে ফল? ওরাও নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা বলবে না, হয়তো আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু সে ভয়ে দ্বিধা করলেন না ক্যাপ্টেন, মাইক্রোফোন তুলে নরওয়েজিয়ান ও ইংরেজিতে সতর্ক করলেন, যদি ওটা এখনই দিক্ না বদলায়, আক্রমণ করতে বাধ্য হবেন তিনি।

উত্তর নেই। একই গতিতে একইদিকে এগিয়ে চলেছে রুশ বাণিজ্য জাহাজ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গান ক্রুদের ওটার রেঞ্জ ও বিয়ারিং জানালেন ক্যাপ্টেন, তারপর শেষবারের মত ওটাকে সতর্ক করার প্রস্তুতি নিলেন। এমন সময় সুমতি হলো রুশ জাহাজটার। স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। একটু কাত হয়ে গেল গতির কারণে।

এক সময় ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে ফিরতি পথ ধরল রুশ বাণিজ্য জাহাজ। ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

লংইয়ারবিয়েন।

কন্ট্রোল টাওয়ারে নিজের ডেস্কে বসে আছে ফ্রেডারিক ফলভিক। আজ খুব ভাল লাগছে তার, খুশি খুশি লাগছে মনটা। সব আবার আগের মত নিজের মনে হচ্ছে।

রাশিয়ানরা চলে গেছে, যেতে বাধ্য হয়েছে। আগের মত অ্যারোফ্লোটের অফিসটা আছে অবশ্য, সীমিত কয়েকজন স্টাফও আছে–ব্যস, ওই পর্যন্তই। নতুন 'ম্যানেজার' এসেছে তাদের, সিমোনভ। মন্দ নয় সে। সিভিলিয়ান, আচার আচরণ ভালই।

মুখ তুলে প্লাটা বেরগেটের দিকে তাকাল ফলভিক, গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা। মাথার বরফের ভার এখন অনেকটা কমেছে তার, আর কদিন পর একদম গলে যাবে। তারপর একদিন ছোট ছোট লাল-হলুদ বুনো ফুল ফুটবে ওপরে, গোটা উপত্যকা ছেয়ে ফেলবে। রেইনডিয়ার ঘুরে বেড়াবে তার মধ্যে।

একটা ধাতব কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে, মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়াল। এক এসএএস ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন ল্যান্ড করার অনুমতি চাইছে। বেখেয়ালে 'রানওয়ে ইজ ফ্রী ফর ল্যান্ডিং' বলতে যাচ্ছিল সে, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল।

দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'ইউ আর ক্লিয়ার টু ল্যান্ড।'

মুচকে হাসল সে। অনেকদিন পর প্রচলিত ইডিয়মটা আওড়াবার সুযোগ পেয়ে ভাল লাগল।

তার জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু হলো আজ থেকে।

আর, হ্যাঁ। মেয়েটা কথা দিয়েছে ওকে।

***